শ্রমিক

বিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭

১. অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ

২. অভিবাসী নারী শ্রমিক: সুরক্ষা ও করণীয়

৩. টেকসই উন্নয়ন - কাউকে পেছনে ফেলে নয়

৪. নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অবস্থান

৫. মহান মে দিবসের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের পাঁচটি শ্রমঘন কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও কর্মঘন্টার পর্যালোচনা

শ্রমিক

বিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

শ্রমিক

বিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ

অ্যাকাডেমিক

ড. মনিরুল ইসলাম খান

ড. মোঃ রেজাউল করিম

ট্রেড ইউনিয়ন

মেসবাহউদ্দীন আহমেদ

রায় রমেশ চন্দ্র

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

শহীদুল্লাহ চৌধুরী

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

রওশন জাহান সাথী

প্রধান সম্পাদক

নজরুল ইসলাম খান

সম্পাদক

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহকারী সম্পাদক

ফারিবা তাবাসসুম

মুদ্রণ

সারকো মিডিয়া এইউ সার্ভিসেস

৮৫/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি: ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩

ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইল: bils@citech.net

ওয়েব: www.bilsbd.org

শ্রমিক

বিংশ বর্ষ | ১ম ও ২য় সংখ্যা | জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

১. অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ ০৭

২. অভিবাসী নারী শ্রমিক: সুরক্ষা ও করণীয় ২৩

৩. টেকসই উন্নয়ন - কাউকে পেছনে ফেলে নয় ২৯

৪. নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অবস্থান ৩৩

৫. মহান মে দিবসের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের পাঁচটি শ্রমঘন কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও কর্মঘন্টার পর্যালোচনা ৪১

সম্পাদকীয়

বিল্‌স বাংলা জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় অভিবাসী শ্রমিকের ইস্যুটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষিতে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসন কর্মী গ্রহণকারী এবং প্রেরণকারী উভয় দেশের জন্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশসহ অন্যান্য কর্মী প্রেরণকারী দেশ বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণ করছে, যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলো অন্যতম। সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ- দু'ভাবেই শ্রমিকদের অভিবাসন হচ্ছে; এবং সেটি বৈধ ও অবৈধ- উভয় উপায়েই। অবৈধ অভিবাসনের অন্যতম ঝুঁকি হচ্ছে পাচার ও হয়রানি শিকার হওয়া, বিদেশের কারাগারে মাসের পর মাস আটক থাকা, মুক্তিপণের ঝুঁকিতে থাকা এমনকি লাশ হয়ে দেশে ফেরা। অভিবাসী শ্রমিকদের নানামুখী ঝুঁকি, হয়রানি ও ভোগান্তির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনী সুরক্ষার বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে "অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ" এবং "অভিবাসী নারী শ্রমিক: সুরক্ষা ও করণীয়" শীর্ষক দুটি প্রবন্ধের মাধ্যমে।

২০১৫ সালে গৃহিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে বদলানোর জন্য মূল লক্ষ্য স্থির করা হয় বিশ্ব দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অসমতা ও বৈষম্য দূর করে সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার। অর্জিত সম্পদের সুষম বন্টন এবং উন্নয়নের সুফল সবার জন্য নিশ্চিত করার কথাও এতে বলা হয়। জোর দিয়ে বলা হয় কাউকে পেছনে ফেলে রেখে টেকসই উন্নয়ন কখনও অর্জিত হবে না। ২০০০ সালে যখন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানেও সুষম সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনৈতিক অসমতা ও বৈষম্য দূর করে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো। এ বিষয়ে "টেকসই উন্নয়ন - কাউকে পেছনে ফেলে নয়" শীর্ষক একটি বিশ্লেষনমুলক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে বর্তমান সংখ্যায়।

শ্রমবাজারসহ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না তাদের সুযোগ-সুবিধা। দূর হচ্ছে না মজুরি বৈষম্য। সমান কাজে সমান মজুরি দেওয়ার আইন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আইন মানা হয় না। একই কাজ করে একজন পুরুষ যে মজুরি পান, একজন নারী পান তার চেয়ে অনেক কম। এই বৈষম্যের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অবস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে।

সর্বশেষ যে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটি বাংলাদেশে কর্মঘন্টা বিষয়ে। কর্মঘন্টাকে আট ঘন্টায় নামিয়ে আনাই ছিল মহান মে দিবসের মূল চেতনা। বাংলাদেশ সরকার এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রথম কনভেনশনটি অনুসমর্থন করেছে। সরকারি ছুটির দিন হিসেবে দিবসটি প্রতি বছরই পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পাঁচটি প্রচলিত শ্রমঘন খাতে মে দিবসের বাস্তবতা নিয়ে বিল্‌স সম্প্রতি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার উদ্দেশ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে মহান মে দিবসের তাৎপর্যের বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ করা। এ সংক্রান্ত "মহান মে দিবসের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের পাঁচটি শ্রমঘন কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও কর্মঘন্টার পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় স্বল্পায়তন বিশ্লেষণধর্মী এই লেখাগুলো তথ্যবহুলও বটে। আশা করা যায় লেখাগুলো পাঠক ও গবেষকদের কাজে লাগবে।

জার্নালটি প্রকাশনায় সহযোগিতার জন্য ফ্রেডরিক ইবার্টি স্টিফটুং (এফইএস) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
সম্পাদক

অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ

কাজী আবুল কালাম[১]

অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান বর্তমান প্রেক্ষিতে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ব্যক্তির অভিবাসনের ক্ষেত্রে কতগুলো অনুষঙ্গ কাজ করে থাকে। স্বদেশে কাজের অপ্রতুলতা, প্রত্যাশা মত কাজের সন্ধান না পাওয়া বা প্রাপ্ত পারিশ্রমিক পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ঠ না হওয়াসহ বিবিধ প্রাসঙ্গিক কারণসমূহ বিদেশে গমন করার জন্য কর্মীকে প্রভাবিত করে থাকে। অপরদিকে জনমিতির ক্রম পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক চাহিদা, ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং পারিশ্রমিকের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপকতাও অভিবাসনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে।

অভিবাসন কর্মী গ্রহণকারী এবং প্রেরণকারী উভয় দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশে কর্মীর স্বল্পতা কর্মী প্রেরণকারী দেশ কর্তৃক পূরণের মাধ্যমে সে দেশের যেমন উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে তেমনি রেমিটেন্স আহরণের মাধ্যমে কর্মী প্রেরণকারী দেশের অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ কারণে অভিবাসনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে উভয় দেশই উপকৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশসহ অন্যান্য কর্মী প্রেরণকারী দেশ বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণ করছে। কিন্তু বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অধিকাংশ কর্মীর গন্তব্যস্থল মধ্যপ্রাচ্য (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান ও বাহরাইন)। এছাড়াও বাংলাদেশ হতে দক্ষিণ-দক্ষিণ দেশসমূহে অভিবাসন হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে মূলতঃ স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে স্বল্প দক্ষ বা আধা-দক্ষ কর্মীরা যান। ১৯৭০ সালের পর তেল সম্পদ প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক হারে নির্মাণ কাজ শুরু হলে বর্ণিত অঞ্চলের কর্মীরা ব্যাপক হারে মধ্যপ্রাচ্যে গমন করে এবং তা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কর্মী গমন

নীচের সারণী-১[২] হতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে মোট শ্রম শক্তি এবং বিদেশী কর্মী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মোট শ্রম শক্তির সিংহভাগ বিদেশী কর্মীর উপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশের মধ্যে কাতারের শ্রম শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অংশই বিদেশী কর্মীর উপর নির্ভরশীল। অপরদিকে সংযুক্ত আরব-আমিরাত, কুয়েত এবং ওমান বহুলাংশে বিদেশী কর্মীর উপর নির্ভরশীল। সে তুলনায় সৌদি আরব এবং বাহরাইন -এ বিদেশী কর্মীর আধিক্য কিছুটা কম। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে আরব ও আফ্রিকার দেশের কর্মীরাও কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো মিশর, সুদান, সিরিয়া,

---

[১] প্রাক্তন যুগ্মসচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

[২] *Source: ADBI-OECD report on Managing Migration to Support Inclusive and Sustainable Growth, 2013(data shown in this report of 2009).*

লেবানন, ফিলিস্তিন, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ইত্যাদি। তবে এশিয়া হতে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কর্মরত আছেন এবং নতুনভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে যাচ্ছেন। এ কর্মীদের অধিকাংশই স্বল্প দক্ষ বা আধা দক্ষ কর্মী এবং স্বল্পকালীন মেয়াদে কাজের জন্য যান। এদের মধ্যে ৪৩% মহিলা কর্মী, যারা গৃহকর্মী পেশায় যাচ্ছেন। সর্বাধিক ২০টি রেমিটেন্স আহরণকারী দেশের মধ্যে এশিয়ার দেশ ৭টি যথাক্রমে- চীন, ভারত, ফিলিপাইন, মিশর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও লেবানন।

সারণী-১

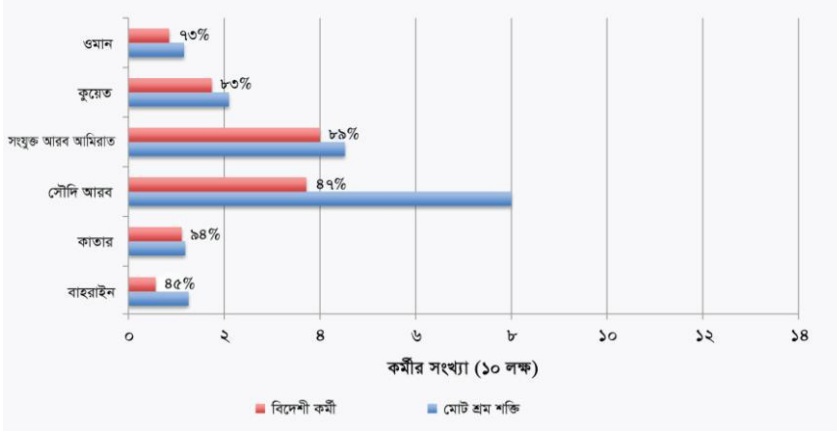

নীচের সারণী-২[৩] হতে আরও লক্ষণীয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কর্মরত মোট বিদেশী কর্মীর মধ্যে দক্ষিণ এশিয় কর্মীর অংশগ্রহণ সর্বাধিক। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা) শ্রম শক্তির প্রাধান্য সুস্পষ্ট। বাহরাইনে দক্ষিণ এশিয় কর্মীরা (৯১%) প্রাধান্য বিস্তার করছে। সৌদি আরবে ৬৬.৬৭% কর্মীই দক্ষিণ এশিয় কর্মী। কাতারে বিদেশী কর্মীর মধ্যে দক্ষিণ এশিয় কর্মী ৬১.৯৫%। অপরদিকে ওমান এবং সংযুক্ত আরব-আমিরাতে বিদেশী কর্মীর মধ্যে দক্ষিণ এশিয় কর্মী যথাক্রমে ৫৭.৩৮% এবং ৫৬.৮৪%।

সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে দক্ষিণ এশিয় দেশ হতে প্রেরণকৃত কর্মীরাই সর্বাধিক এবং তারা বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত আছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কর্মীরা একজন নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করে থাকেন, যা 'কাফালা সিস্টেম' নামে অধিক পরিচিত। এর অর্থ হলো কর্মীর পাসপোর্ট নিয়োগকর্তার নিকট থাকে এবং উক্ত কর্মীর যে কোন প্রকার চলাচল বা নিয়োগকর্তা পরিবর্তন, বেতন-ভাতা, ছুটি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়াদি সম্পূর্ণভাবে ঐ মহা শক্তিধর নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুত

---

[৩] *প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৫ম শ্রম এ্যাটাশে সম্মেলনে (২০১৩) শ্রম এ্যাটেশেগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।*

একজন কর্মীর কাজের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার স্বাধীনতা থাকে না। অভিবাসী কর্মীরা বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে থেকে কাজ করছেন। ফলে, তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষিণ এশিয় দেশসমূহের কর্মীর আধিক্য দেখে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ এশিয় দেশসমূহ সম্মিলিতভাবে কর্মী গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে কর্মীর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

সারণী-২

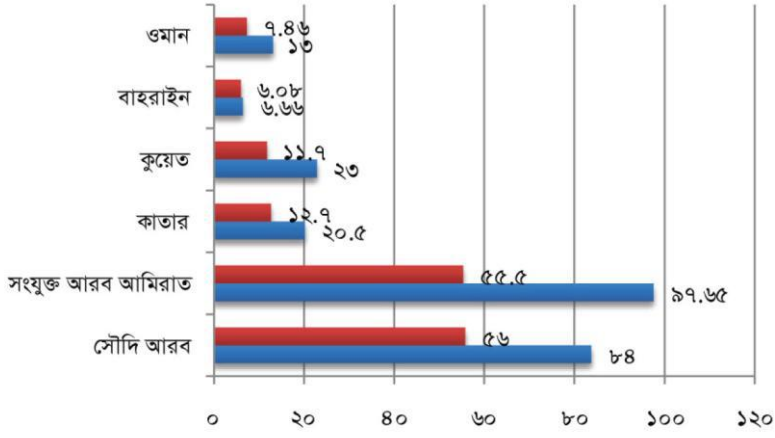

অভিবাসনের মূল নিয়ামক যেহেতু কর্মী, সেহেতু কর্মীর চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক। যে দেশ কর্মী গ্রহণ করছে সে দেশের শ্রম আইন তার নিজস্ব শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সু সমন্বয় করে পরিচালিত হবে। এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, বিদেশে কর্মক্ষেত্রে কর্মীরা আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুযায়ী কাজের পরিবেশ এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী ও সময় মত পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু এটি অনস্বীকার্য যে, প্রবাসে কর্মীরা প্রায়শই নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনিয়ম বা প্রতারণার শিকার হন এবং কখনও কখনও অনিয়মিতভাবে অথবা যথাযথ পারিশ্রমিক হতেও বঞ্চিত হন।

অভিবাসী কর্মীর জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা তাঁদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ২০ ও ৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাজের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একটু পিছনে ফিরে দেখলে দেখা যায় যে, সরকার ১৯৭৬ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান

ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) স্থাপন করে[৪], যা পরবর্তীতে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে এর কার্যক্রম চালিয়ে যায়। বিএমইটি দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য সেই থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় এবং বিএমইটি এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়। মূলতঃ এর পর থেকে বিএমইটি শুধুমাত্র বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী প্রশিক্ষণসহ অভিবাসনের সামগ্রিক বিষয়টি তত্ত্বাবধান করছে। বিএমইটি'র অধীনে ৪২টি জেলা কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ক সেবা প্রদান করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজলভ্য করা, অভিবাসন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রবাসে কর্মীর অধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিদেশে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বিদেশে কর্মরত কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকারের বিষয় নিশ্চিতকল্পে ১৯৮২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর The Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) জারী করা হয়। 'অভিবাসন অধ্যাদেশ, ১৯৮২' এর অধীনে বাংলাদেশ হতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের স্বার্থ ও তাঁদের অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত বর্ণিত অধ্যাদেশের স্থলে সময়োপযোগী ও যথাযথ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে।

'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩'

'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' -তে অভিবাসী কর্মী প্রেরণে স্বচ্ছতা, রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা এবং রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যক্রমের মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ আইনে অভিবাসী কর্মীর অধিকার ও সুরক্ষা প্রদানে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ধারা-২৬ এ কর্মীকে বিদেশ গমন বিষয়ক তথ্য পাবার অধিকার দেয়া হয়েছে। ধারা-২৭ এ অভিবাসী কর্মীর আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এতদিন প্রতারিত কর্মী নিজে কোনো আদালতে মামলা করতে পারত না। এ আইনের ধারা-৩৮ অনুযায়ী একজন প্রতারিত কর্মী যে কোনো প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ক্ষেত্রমতে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে সরাসরি মামলা করার সুযোগ পাবে। অপরদিকে বিদেশ প্রেরণ বিষয়ক কোনো অপরাধের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি বা অপরাধীকে ধারা-৪০ অনুযায়ী দ্রুত বিচার আদালতে তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা করা যাবে। নতুন আইনে অভিবাসন বিষয়ক প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ছাড়াও মিথ্যা তথ্য প্রদান (ধারা-৩১), ভিসা কেনা-বেচা (ধারা-৩৩), অবৈধ অভিবাসন (ধারা-৩১), নির্দিষ্ট স্থান ব্যতিরেকে বিদেশে

---

[৪] উৎসঃ বিএমইটি গঠন সংক্রান্ত আদেশ

প্রেরণ (ধারা-৩৪), সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বৈদেশিক কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অভিবাসন বিষয়ক কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে (ধারা-৩২) শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এছাড়া বিএমইটি'র তথ্য ভান্ডার হতে কর্মী প্রেরণ (ধারা-১৯) করার বিষয়েও বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে। আশা করা যায় নতুনভাবে প্রণীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও চর্চার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর অধিকার সত্যিকার অর্থে সংরক্ষিত হবে এবং একজন কর্মীর অভিবাসন মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন হবে।

'অভিবাসন অধ্যাদেশ, ১৯৮২' এর অধীনে অভিবাসনের জন্য প্রাসঙ্গিক ৩টি বিধি যথাক্রমে 'বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২', 'রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২' এবং 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২' প্রণীত হয়েছে। উল্লিখিত ৩টি বিধিমালার মাধ্যমে অভিবাসনের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়াদির প্রায়োগিক দিকসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। নতুনভাবে প্রণয়নকৃত 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩'-এর আলোকে নতুন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এ বিধিমালাসমূহ কার্যকর থাকবে। বিদ্যমান বিধিমালায় অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়াদি নিম্নরূপ ঃ

বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২

এ বিধিমালা অনুযায়ী বিদেশগামী কর্মীর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বিধির ধারা-৪ অনুযায়ী নিবন্ধক বিদেশে নিয়োগ বিষয়ে এজেন্সিকে সহায়তা প্রদান করবেন এবং বিদেশগামী কর্মীকে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করবেন। ধারা-৬ অনুযায়ী সরকার শ্রম এ্যাটাশে নিয়োগ করবে এবং উক্ত শ্রম এ্যাটাশে ধারা-৭ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীর কল্যাণে ও স্বার্থরক্ষায় কাজ করবেন, আবাসন, চিকিৎসা সহায়তা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনে আইনি সহায়তা প্রদান করবেন। ধারা-২১ অনুযায়ী নিবন্ধক বা রিক্রুটিং এজেন্টগণ বিদেশগামী কর্মীকে বিদেশের প্রচলিত বিধি, বৈদেশিক চাকুরি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়াদি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য পরামর্শ ও পরিচিতি অধিবেশন পরিচালনার জন্য পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করবে এবং কর্মীকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে প্রামাণ্য চিত্র, পুস্তিকা, ক্যাসেট ইত্যাদি প্রকাশ করবে। ধারা-২৩ অনুযায়ী কোন অভিবাসী কর্মী রিক্রুটিং এজেন্ট সম্পর্কে অভিযোগ করলে নিবন্ধক তার শুনানী করবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। ধারা-২৪ অনুযায়ী সরকার অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। ধারা-২৫ অনুযায়ী শ্রম এ্যাটাশে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে এবং ধারা-২৬ অনুযায়ী শ্রম এ্যাটাশে নিয়োগকর্তাকে চুক্তি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণে সম্মতি আদায়ের চেষ্টা গ্রহণ করবেন।

রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২

এ বিধিমালায় লাইসেন্স পাওয়ার আবেদন, লাইসেন্সের বৈধতা ও নবায়ন, রিক্রুটিং এজেন্টের আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ধারার মধ্যে অন্যতম হলো ধারা-৫ এবং এ ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নকালে নিবন্ধক এই মর্মে সন্তুষ্ট হবেন যেন উক্ত রিক্রুটিং এজেন্সি বিদেশে

কর্মী প্রেরণের কারণে কোনো অপরাধ করেননি বা দুষ্কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না বা বিদেশে কর্মী প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেননি। এছাড়া, ধারা-৭ অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্ট কর্মীর বেতন-ভাতার নিশ্চয়তা প্রদান করবে, চুক্তির কপি কর্মীকে প্রদান করবে, সার্ভিস চার্জ ব্যতীত কোনো কর্মীর নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করবে না, বিদেশে কর্মী নিয়োগ বিষয়ে ভূয়া ভিসা ব্যবহার করবে না ইত্যাদি।

প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭ (খসড়া)

এ আইন অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীর কল্যাণে 'প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড' গঠন করা হয়েছে এবং এর আলোকে প্রবাসীদের কল্যাণে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত এ আইনে প্রথমবারের মত বিদেশ প্রত্যাগত ০২ জন অভিবাসী কর্মীকে বোর্ডের পরিচালনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনের ধারা-৯ এ বোর্ডের কার্যাবলীতে অভিবাসী কর্মীর কল্যাণার্থে বিবিধ কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ধারা-১০ এ নারী অভিবাসী কর্মীর কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা, চিকিৎসা সুবিধা, দেশে-বিদেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বোর্ডের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য গমনকারী দেশের নিয়ম-কানুন, প্রচলিত বিধি নিষেধ, সামাজিক রীতিনীতি, আবহাওয়া, পরিবেশ, ভাষা, শ্রম আইন এবং চাকুরির চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ব্রিফিং প্রদান করা, বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, কর্মীদের দেশে ফেরত আনা, বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান হবে এবং বিদেশে আইনগত সহায়তা প্রদান করার বিষয়সমূহ প্রস্তাবিত আইনে রয়েছে।

অভিবাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত জাতীয় আইনের পাশাপাশি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক আইন বা কনভেনশন রয়েছে, যা অভিবাসী কর্মীর স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ আইন বা কনভেনশনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

শ্রম অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন

অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক আইনগত কাঠামো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একজন অভিবাসী কর্মীর বৈধভাবে অবস্থান বা অভিবাসনকারী দেশে অবস্থানের দৈর্ঘ্যের উপর তাঁর মানবাধিকার নির্ভর করে না। সকল অভিবাসীই একজন মানুষ এবং অভিবাসনকারী দেশের অন্যান্য নাগরিকের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা পাবার মত এবং সাধারণ অধিকার পাবার মৌলিক অধিকার একজন অভিবাসী কর্মীর রয়েছে[৫]। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে 'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা'-এর গ্রহণের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। এরূপ ঘোষণার আর্টিকেল-১৩ অনুযায়ী

---

[৫] আইওএম ২০০৪; Essential of Migration Management: A Guide for Policy Makers and Protectioners.

কোন ব্যক্তির প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসত স্থাপন এবং নিজের দেশ বা যে কোন দেশ ছেড়ে যাবার এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে। এছাড়াও আর্টিকেল-২৩ অনুযায়ী প্রত্যেকেরই কাজ করার অধিকার, চাকুরি নির্বাচনের অধিকার, বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাবার অধিকার রয়েছে। অভিবাসন আইন ঐতিহাসিকভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক গমনাগমনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রও প্রকারান্তরে অভিবাসনের বিষয়টি এককভাবে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের ভাবনা থেকে সরে এসেছে। রাষ্ট্র এ পর্যায়ে অভিবাসনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেয়া শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন আইনের উপাদানগুলো হলো ঃ মানবাধিকার, বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকের রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্ব, অনিবাসী নাগরিকের কনস্যুলার সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা, মানব পাচার এবং অভিবাসী কর্মী চোরাচালান, শ্রম অভিবাসন বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন।

অভিবাসী কর্মীর জন্য আন্তর্জাতিক আইন

অভিবাসী কর্মীর অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রধান আন্তর্জাতিক আইনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- Convention Concerning Migration for Employment (Revised), ILO, No. 97 of 1949
- Convention Concerning Migrants in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers, ILO No. 143 of 1975
- International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), UN, 1990
- Convention Concerning Decent Works for Domestic Workers, 2011-ILO Convention 189

Convention Concerning Migration for Employment (Revised), ILO, No. 97 of 1949[৬]

State Parties to the ILO Convention No. 97 undertake to apply the principle of non discrimination to documented migrants, including women migrant domestic workers, with respect to remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of work, overtime arrangements, holidays with pay, and social security.

[৬] http://en.wikipedia.org/wiki/Migration_for_Employment_Convention_Revised29_1949.

অভিবাসনের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ে তথ্যাদি আদান-প্রদান বিষয়ে এ কনভেনশনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর অভিবাসন সংক্রান্ত এ কনভেনশন অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ -

(ক) অভিবাসন (emigration) এবং বহির্গমন (Immigration) সংক্রান্ত জাতীয় আইন, বিধি ও নীতি বিষয়ক তথ্যাদি আদান-প্রদান করবে;

(খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলীসহ অভিবাসী কর্মীর কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কাজের পরিবেশ ও জীবন মান বিষয়ে তথ্যের আদান প্রদান করবে; এবং

(গ) অভিবাসন বিষয়ে সাধারণ চুক্তি বা বিশেষ ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি আদান-প্রদান করবে।

৪৯টি দেশ এ কনভেনশন র‍্যাটিফাই করলেও বাংলাদেশ এ কনভেনশন এখনও র‍্যাটিফাই করেনি।

Convention Concerning Migrants in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers, ILO No. 143 of 1975[৭]

ILO Convention No. 143 supplements ILO Conventions No. 97 and 111 and recognizes that there is a need for State Parties to respect the basic human rights of all migrant workers. State Parties to Convention No. 143 guarantee that a migrant worker shall not be regarded as in an illegal or irregular situation by the mere fact of the loss of his employment. The worker shall also enjoy the guarantee of security of employment, the provision of alternative employment relief work and retraining.

অভিবাসী কর্মীর নির্যাতনকালীন অবস্থা এবং সমসুযোগ ও বিচার লাভের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আইএলও-এর এ কনভেনশনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কনভেনশনের আর্টিকেল-১ অনুযায়ী যে সকল সদস্য রাষ্ট্রের উপর এটি প্রযোজ্য তারা সকল অভিবাসী কর্মীর মৌলিক মানবাধিকারকে সম্মান প্রদান করবে এবং আর্টিকেল-১১ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী বলতে ঐ ব্যক্তিকে বোঝাবে যে ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য এক দেশ হতে অন্য দেশে গিয়েছেন বা যেতে চাচ্ছেন। এ কনভেনশনটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না

---

[৭] http://en.wikipedia.org/wiki/Migrant_Workers_Supplementary_Provisions_Convention,_1975

যারা- (১) ফ্রন্টিয়ার কর্মী, (২) শিল্পী এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত সদস্য, (৩) নাবিক এবং (৪) যে সকল ব্যক্তি বিশেষ করে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছেন।

২৩টি দেশ এ কনভেনশন র‍্যাটিফাই করলেও বাংলাদেশ এ কনভেনশন এখনও র‍্যাটিফাই করেনি।

International Convention of the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), UN, 1990[৮]

The primary objective of the Convention is to foster respect for migrant's human rights. Migrants are not only workers, they are also human beings. The Convention does not create new rights for migrants but aims at guaranteeing equality of treatment, and the same working conditions for migrants and nationals. The Convention innovates because it relies on the fundamental notion that all migrants should have access to a minimum degree of protection. The Convention recognizes that legal migrants have the legitimacy to claim more rights than undocumented migrants, but it stresses that undocumented migrants must see their fundamental human rights respected, like all human beings.

এটা অনস্বীকার্য যে, বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীরা সহজেই প্রতারণার শিকার হতে পারেন এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে বিধায় তারা যে কোন সময় মানবপাচারের শিকারও হতে পারেন, সেহেতু সকল অভিবাসী কর্মী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ও অধিকার সংক্রান্ত এ কনভেনশটি ১৯৯০ সালে গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এ কনভেনশন গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সকল অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা বৈধ কাগজপত্র বা অনিয়মিত অভিবাসনের কারণে সমস্যাগ্রস্ত রয়েছেন তাদেরকে সহায়তা করা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অভিবাসী কর্মীর অধিকারকে স্বীকৃতি ও তাদের সুরক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এ কনভেনশন সহায়ক হয়েছে। এর ফলে অভিবাসী কর্মীরা যে সমস্যায় পড়ছে তা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, অনিয়মিত অভিবাসনের নিয়ামকসমূহ কী কী এবং এ ধরণের অভিবাসী কর্মীরা যে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার এটিও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী কর্মীর প্রতি ভয় বা ঘৃণা, হীনমন্যতাবোধ অভিবাসনের

[৮] http://www.claiminghumanrights.org/icrmw.html

প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকে যে কারণে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী দেশের সরকার এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ কনভেনশনের ধারা-৭ অনুযায়ী রাষ্ট্র মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম বা বিশ্বাস, রাজনৈতিক, জাতীয়তা, জাতিগত বা সামাজিক ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল অভিবাসী ও তার পরিবারের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করবে, কোন বৈষম্য করবে না। ধারা ৮ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদের নিজ দেশসহ যে কোন দেশে ত্যাগের স্বাধীনতা এবং যে কোন সময় নিজ দেশে প্রবেশ এবং সেখানে অবস্থান করার অধিকার থাকবে। ধারা-৯ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনের প্রতি যে অধিকার রয়েছে তা আইন দ্বারা রক্ষা করতে হবে। ধারা-১০ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কোন সদস্য কোন ধরণের নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির শিকার হতে পারবে না। ধারা-১১ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কোন সদস্যকে দাসত্ব বা তার সমতুল্য পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না, কোন সদস্যকে বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না, ধারা-১২ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মুক্ত চিন্তার, বিবেকের এবং ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে, ধারা-১৩ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কোন ধরণের বাধা ছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, ধারা-১৪ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বাসস্থান, পারস্পরিক যোগাযোগের উপর অযৌক্তিকভাবে বা বেআইনীভাবে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না, ধারা-১৫ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অযৌক্তিকভাবে বা বিধি বহির্ভুতভাবে তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং বৈধভাবে এরূপ কোন কিছু করা হলে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে, ধারা-১৬ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে বিনা কারণে আটক করা বা সাজা দেয়া যাবে না, কাউকে এমনভাবে আটক করা হলে তাদেরকে আটক করার সময় যথাসম্ভব যে ভাষা তারা বুঝতে পারে সে ভাষায় আটকের কারণ তাদেরকে বলতে হবে, ধারা-১৭ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যারা তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতে হবে এবং একজন মানুষ হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা ও তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মেনে চলতে হবে, ধারা-২০ অনুযায়ী শুধুই চুক্তি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এই অভিযোগে কোন অভিবাসী কর্মী বা তার পরিবারের কোন সদস্যকে আটক করা যাবে না, ধারা-২২ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিতভাবে বহিষ্কার করা যাবে না, বহিষ্কারের প্রতিটি কেস পৃথকভাবে পরীক্ষা করতে এবং পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, ধারা-২৫ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী যারা তার কর্মস্থলের দেশের নাগরিকদের সমান বেতন ভাতা ও অধিকার পাবেন ইত্যাদি।

এ কনভেনশটি প্রকৃত অর্থে অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছে। এর বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একজন অভিবাসী কর্মী এমনকি তার পরিবারের সদস্যরা নিজ দেশের মতই সকল সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার কর্মরত দেশেও ভোগ করার অধিকার রাখেন। বিশেষ করে কনভেনশনের ধারা-৬৪ অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বিষয়ে যাতে একটি সুস্থ, সমঅধিকারপূর্ণ এবং মানবিক অবস্থা তৈরী করা যায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করবে এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করবে। অর্থাৎ কর্মী গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী উভয় দেশই যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ সরকার এ কনভেনশনের অধীনে প্রবাসী কর্মীর স্বার্থরক্ষায় যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট উপস্থাপন করেছে।

Convention Concerning Decent Works for Domestic Workers, 2011-ILO Convention 189

The main rights given to domestic workers as decent work are daily and weekly (at least 24 h) rest hours, entitlement tominimum wage and to choose the place where they live and spend their leave. Ratifying states parties should also take protective measures against violence and should enforce a minimum age which is consistent with the minimum age at other types of employment. Workers furthermore have a right to a clear (preferably written) communication of employment conditions which shold in case of international recruitment be communicated prior to immigration.

গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত কর্মীদের শোভন কাজ সংক্রান্ত এ কনভেনশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কনভেনশনে গৃহস্থালি কাজে কর্মীর শ্রমের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। গৃহস্থালি কাজ বলতে ঘরের অভ্যন্তরে বা ঘরের কাজে নিয়োগ সম্পর্কিত চুক্তির অধীনে কাজকে বোঝায় এবং গৃহস্থালি কর্মী বলতে যে ব্যক্তি ঘরের অভ্যন্তরে বা ঘরের কাজে নিয়োগ সম্পর্কিত চুক্তির অধীনে নিযুক্ত এবং তিনি গৃহস্থালি কর্মী নন যিনি বা যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে অথবা কখনও কখনও এবং পেশাগতভাবে এমন ধরণের কাজে নিয়োজিত হন না ।

এ কনভেনশন অনুযায়ী গৃহস্থালি কর্মীকে শোভন কাজের জন্য দৈনিক এবং সাপ্তাহিক কাজের ক্ষেত্রে বিশ্রামের জন্য সময় প্রদান, ন্যূনতম বেতন প্রদান, আবাসস্থল পছন্দের সুযোগ প্রদান এবং ছুটি ভোগের সুযোগ প্রদান করতে হবে। এ কনভেনশনটি যে সকল

রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেছে সে সকল রাষ্ট্র গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত কর্মীর জন্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ ধরণের কাজের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করবে। গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত কর্মীর সঙ্গে কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত চুক্তি থাকবে এবং কর্মী যে বাসায় কাজ করবে সে বাসায় নাও থাকতে পারেন অথবা উক্ত বাসায় ছুটির সময় থাকতে পারেন। এ কনভেনশনটি ১০টি দেশ[৯] যথা- বলিভিয়া, জার্মানি, গায়ানা, ইতালি, মরিশাস, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উরুগুয়ে স্বাক্ষর করেছে।

উপরোল্লিখিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ছাড়াও The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)[১০] (বাংলাদেশসহ ১৮৭টি দেশ এ কনভেনশন র‍্যাটিফাই করেছে) অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত ILO Multilateral Framework (MLF) হলো বৈশ্বিক পরিকাঠামোর অধীনে অভিবাসন বিষয়ক নীতি ও গাইডলাইনসমূহ এবং অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত সুন্দর অনুশীলনসমূহ, যা অবশ্য পালনীয় নয় (non-binding)। আইএলও এর MLF এর মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর জন্য শোভন কাজ, অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা, অভিবাসী কর্মীর নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী বিদেশের বিভিন্ন দেশে কাজের জন্য যান। পরিসংখ্যানমতে বাংলাদেশ হতে প্রায় ৮০% কর্মী মধ্যপ্রাচ্যের দেশেসমূহে বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত হচ্ছেন। অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক কনভেনশনের উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল কনভেনশনের কোনটিতেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ স্বাক্ষর করেনি। ফলে অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণের কার্যক্রম যে প্রার্থিত মাত্রায় ফলপ্রসূ হবে না তা সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে কর্মী প্রেরণকারী দেশসমূহের আঞ্চলিক সংগঠন 'কলম্বো প্রসেস' এবং 'আবুধাবী সংলাপ' সম্পর্কিত কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও এর বাস্তবায়ন অভিবাসী কর্মীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিবাসী কর্মীর যেমন অধিকার রয়েছে তার বিভিন্ন ধরণের অধিকার পাওয়ার তেমনি অভিবাসী কর্মীরও কিছু বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। কর্মী যে দেশে গমন করছেন সে দেশের আইন-কানুন, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবেন ও সে দেশে যাওয়ার পর বৈধ আইনানুগ বিষয়াদি মানবেন ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এটাই প্রত্যাশিত।

---

৯ en.wikipedia.org/wiki/convention_domestic_workers.

১০ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মী গ্রহণকারী দেশ এবং কর্মী প্রেরণকারী দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। এ সকল চুক্তি অভিবাসী কর্মীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে থাকে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঃ

বৈদেশিক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

যেহেতু বিদেশে কর্মী প্রেরণের নিমিত্ত বা উক্ত দেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু কর্মী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সর্বদাই কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। নতুনভাবে প্রণীত 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' এর ধারা-২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ও অভিবাসী কর্মী তার পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে। এ ধরণের চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকালে অভিবাসী কর্মীর অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা, কর্মীর শ্রম অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকারের সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কর্মী গমনকারী দেশে কর্মীর তথ্য পাবার অধিকার এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাবার অধিকার নিশ্চিতকরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। বিধি মোতাবেক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের সংসদ কর্তৃক র‍্যাটিফাই করা প্রয়োজন; অপরদিকে সমঝোতা স্মারকের ক্ষেত্রে এ ধরণের বাধ্যবাধকতা নেই। এ কারণে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরকারী দেশের জন্য অবশ্য পালনীয় নয় (non-binding)। মূলতঃ এ ধরণের চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে কর্মী গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী দেশের কার কি দায়িত্ব, কর্মী নিয়োগ বিষয়ে তথ্যের আদান প্রদান, কর্ম চুক্তি (employment contract), কর্মীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম, নিয়োগকারীর দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। তবে, প্রায় প্রতিটি চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকে উভয় দেশের মধ্যে একটি 'জয়েন্ট কমিটি' গঠনের মাধ্যমে চুক্তির বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কর্মী গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে এ ধরণের চুক্তি থাকলেই যে নিয়মিতভাবে কর্মী গমন অব্যাহত থাকবে বা গমনকারী দেশে কর্মীর স্বার্থ সংরক্ষণ হবে তা সর্বক্ষেত্রেই সত্য নয়। তবে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত চুক্তি বা স্মারক স্বাক্ষরের সময় কর্মীর স্বার্থ সংরক্ষণে যতটুকু সম্ভব দর কষাকষি করা যায় তা প্রেরণকারী দেশের স্বার্থের অনুকূল হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দেশের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ঃ

ছক-১

দেশ	দ্বিপাক্ষিক চুক্তি	সমঝোতা স্মারক
বাংলাদেশ	কাতার (১৯৯৮, ২০০৮), কুয়েত (২০০০)	সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ওমান (২০০৮), দক্ষিণ কোরিয়া (২০০৭, ২০১০, ২০১২), লিবিয়া (২০০৮), মালদ্বীপ (২০১১), মালয়েশিয়া (২০০৩, ২০০৬, ২০১২, ২০১৬), জর্ডান (২০১২), ইরাক (২০১৩), হংকং (বিএমইটি-রিক্রুটিং এজেন্সি-২০১২)

বাংলাদেশ যেমন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে তেমনি কর্মী প্রেরণকারী অন্যান্য দেশও কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে একই ধরণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রতিটি দেশেরই এ ধরণের চুক্তি স্বাক্ষরের মূল লক্ষ্য হলো কর্মীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ। কর্মী প্রেরণকারী উল্লেখযোগ্য দেশসমূহের বৈদেশিক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সংক্রান্ত তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে দেখা যেতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত কর্মীরা (গৃহকর্মী, দারোয়ান, ড্রাইভার, মালি ইত্যাদি) উক্ত দেশের শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত নন। ফলে, এ সকল পেশায় নিয়োজিত কর্মীর সমস্যা শ্রম আদালত কর্তৃক বিচার্য নয় বিধায় নিয়োগকর্তার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা ব্যতিরেকে কর্মীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন উপায় নেই। মধ্যপ্রাচ্যে গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি একটি বড় অন্তরায় হিসেবে দেখা যাচ্ছে। উপরন্তু কর্মী গ্রহণকারী অনেক দেশই বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ আইএলও-এর বর্ণিত কনভেনশনসমূহ স্বাক্ষর করেনি; যদিও ৮৫% কর্মী বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যেই গমন করছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষিণ এশিয় কর্মীরাও মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন। এ কারণে কর্মীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান রক্ষা করার বিষয়টি সর্বদাই একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

অভিবাসনের সামগ্রিক কার্যক্রম বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন সংগঠন/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত থাকে। আদর্শিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অভিযোগ থাকে না; তবে সরকারের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই কর্মী প্রতারণার অভিযোগ থাকে। অভিযোগসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বিদেশে প্রেরণের কথা বলে যথাসময়ে বিদেশে প্রেরণ না করা, অতিরিক্ত অর্থ দাবী করা, বিদেশে গমনের পর প্রতিশ্রুত কাজ বা বেতন না পাওয়া ইত্যাদি। বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ ধরণের অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে নিষ্পত্তি করে থাকেন। তবে অধিকাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রেই দায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ

রিক্রুটিং এজেন্সি যদি যথাসময়ে শুনানির জন্য বিএমইটিতে উপস্থিত হন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করে তাহলে অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। বলা বাহুল্য বাস্তব অবস্থা তা নয়। তবে আশা করা যায় নতুন প্রণয়নকৃত 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' -এর মাধ্যমে আদালতে মামলা দায়ের করার মধ্য দিয়েও প্রতারিক কর্মী প্রতিকার পেতে পারেন।

শ্রম উইং এবং প্রদেয় সেবা

বিদেশে যে সকল দেশে অধিকাংশ প্রবাসী কর্মী কর্মরত আছেন সে সকল দেশের দূতাবাসে এক বা একাধিক শ্রম উইং সৃজন করা হয়েছে। সৌদি আরবে ২টি এবং সংযুক্ত আরব-আমিরাতে ২টিসহ ১৪টি দেশে মোট ১৬টি শ্রম উইং যথা- রিয়াদ, জেদ্দা, আবুধাবী, দুবাই, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, জর্ডান, সিঙ্গাপুর ও ইটালী সৃজন করা হয়েছে। এ সকল শ্রম উইংয়ের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদেরকে সেবা প্রদান করা হয়। মূলতঃ কর্মীদের চাকুরির শর্তানুযায়ী বেতন না পাওয়া, অনিয়মিত বেতন পাওয়া, বেতন একেবারেই না পাওয়া, আবাসস্থল মানসম্মত না হওয়া, নিয়োগকর্তা পরিবর্তনের সুযোগ না থাকা, চিকিৎসা সুবিধার অপ্রতুলতা, ইকামা (মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে) প্রদান বা নবায়ন না করা, নিয়োগকর্তা কর্তৃক যথাসময়ে পাসপোর্ট প্রদান বা নবায়ন না করা, ছুটি প্রদান না করা ইত্যাদি সমস্যার কারণে অভিবাসী কর্মী দূতাবাসের শ্রম উইংয়ে সেবা পেতে আসেন। এছাড়াও শ্রম উইং প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণসহ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আদায় করে থাকে। নতুন শ্রম উইং হিসেবে অস্ট্রেলিয়া, মিশর, স্পেন, রাশিয়া, গ্রীস, মালদ্বীপ, জেনেভা, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, হংকং, মিলান, লেবানন ও মরিশাস সৃজন করা হয়েছে। সরকার বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃজন, অভিবাসন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এর গতি প্রকৃতির সঙ্গে যথাযথ প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের সেবা প্রদান ও স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে শ্রম উইং সৃজনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে আইনসমূহ রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ হওয়া আবশ্যক। কর্মী প্রেরণকারী দেশের যেমন দায়িত্ব আছে তার দেশের আইনের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসনের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা; তেমনি কর্মী গ্রহণকারী দেশেরও সমভাবে দায়িত্ব রয়েছে সে দেশে কর্মরত কর্মীর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার। কর্মী গ্রহণ ও প্রেরণকারী দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের অনুসরণই কেবলমাত্র নিশ্চিত করতে পারে অভিবাসী কর্মীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ তথা মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. World Bank, 2011. Migration and Remittances Handbook 2011.

২. IOM, 2011. Glossary on Migration. 2nd Edition. Geneva: IOM.

৩. IOM, 2004a. Essentials of Migration Management: A Guide for Policy and Practicioners. Geneva: IOM.

৪. IOM. n.d.a. Human Rights Instruments. [online] Available at: <http://iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-management-foundations rights-obligations-migrants/human-rights-instruments>

৫. IOM. n.d.b. International Law and Migrants Rights and Obligations. [online] Available at: <http://iom.int/jahia/Jahia/about-migration/ migration-management-foundations/ rights-obligations-migrants/ international-law-migrant-rights-obligations>

৬. IOM. n.d.c. International Migration Law. [online] Available at: <http://iom.int/jahia/Jahia/about-migration / migration-management-foundations/ about-migration-international-migration-law>

৭. Rights, Remittances and Reintegration: Women Migrant Workers and Returnees in Sri Lanka; B. Skanthakumar (Ed.), Law & Society Trust, www.lawandsocietytrust.org

৮. Labour Migration from Colombo Process Countries: Good practices, Challenges and ways forward, Issue No. 1, May 2012, Migration Policy Institute.

৯. Paper presented on the Trends and Outlook for Labour Migration in Asia: The 3rd ADBI-OECD-ILO Roundtable on Labour Migration in Asia: Assessing Labour Market Requirements for Foreign Workers and Developing Policies for Regional Skills Mobility.

১০. http://www.reuters.com/article/2013/02/07/us-oman-jobs-foreigners-idUSBRE9160S020130207.

অভিবাসী নারী শ্রমিক: সুরক্ষা ও করণীয়

এড. নজরুল ইসলাম [১]

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে নারী শ্রমিকদের বিদেশে অভিবাসনের হার ক্রমাগত বাড়ছে। **বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর তথ্যে দেখা যায় ২০১৩ সালে ৫৪৪০০ ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৬২৪৪০ জন নারী শ্রমিক চাকুরি নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা ৮৮,৩৬৫ জন।** বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অভিবাসী নারী শ্রমিকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। পৃথিবীর যেসকল রাষ্ট্র বিদেশে নারী শ্রমিক প্রেরণ করে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকগণ সেকল রাষ্ট্রে অভিবাসী কর্মী হিসেবে যান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, লেবানন, জর্ডান, ওমান, সিংগাপুর, হংকং, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ব্রুনেই, মরিশাসইত্যাদি। নারী অভিবাসী শ্রমিকদের প্রধান গন্তব্য অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য। নারী শ্রমিকগণ বিদেশে মূলত গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া তারা গামেন্টস, বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরীতে, ক্লিনার,দোকানে বিক্রয় কর্মী ইত্যাদি পেশায় কাজ করেন। খুব সামান্য হলেও কিছু নার্সিং পেশায় নিয়োজিত।

সরকারি উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে- দুভাবেই নারী শ্রমিকদের অভিবাসন হচ্ছে; বৈধ ও অবৈধ- দুই রাস্তায়ই অভিবাসন হচ্ছে। অবৈধভাবে অভিবাসনের অন্যতম ঝুঁকি হচ্ছে পাচারের শিকার হওয়া। যারা বৈধ পথে যাচ্ছেন তারা গন্তব্য দেশে প্রায়শ:ই চুক্তি অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, বেতন কম পাওয়া, কর্মঘন্টা বেশি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকারের অভিবাসী শ্রমিকগণ প্রায়শ:ই এজেন্সি ও নিয়োগকারী দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অনেক শ্রমিককে গন্তব্য দেশের কারাগারে মাসের পর মাস আটক থাকতে হচ্ছে, প্রতারক এজেন্সিগুলো অনেকসময় মুক্তিপণের দাবিতে শ্রমিকদের আটক করে রাখে। প্রতিনিয়ত বিদেশ থেকে অনেক অভিবাসী শ্রমিকের লাশ আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়!

অভিবাসনের পূর্বে, বিদেশে এবং ফেরত আসা নারী শ্রমিকদের দুর্ভোগ:

অভিবাসনের পূর্বে দুর্ভোগ: অভিবাসনে ইচ্ছুক শ্রমিকদের অভিবাসন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় তারা প্রতারক এজেন্সি ও দালালের খপ্পরে পড়ে অনেকেই নি:স্ব হয়। অভিবাসনের পূর্বে সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ যথাযথ ও যুগোপযোগী না

---

[১] এডভোকেসি অফিসার, বিল্‌স

হওয়ায় গন্তব্য দেশের সংস্কৃতি ও আইনকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা না নিয়েই শ্রমিকগণ বিদেশে যাওয়ায় নানারকম সমস্যায় পতিত হয়। অভিবাসনের পূর্বে শ্রমিকগণ যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন তা ইংরেজী ভাষায় হওয়ায় এর বিন্দুবিসর্গও শ্রমিকগণ অনুধাবন করতে পারে না।

বিদেশে নারী শ্রমিকদের দুর্ভোগঃ সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর এই নারী শ্রমিকগণ স্বামী সন্তান পরিবার ছেড়ে ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির দেশে এসে প্রচন্ড রকম একাকিত্ব ও হতাশায় ভোগেন। বিদেশে তাদের খাবার সমস্যা হয় প্রকট। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে যেসকল শ্রমিকগণ কাফালা সিস্টেমের আওতায় কাজ করেন তাদেরকে কর্মচুক্তির শর্তানুযায়ী আবশ্যিকভাবে নিয়োগকারীর বাসায় পূর্ণকালীন কাজ করতে হয়। কাজ পরিবর্তন করতে গেলে তাদেরকে নিয়োগকারীর পুর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হয়। অনুমোদন ব্যতিত কাজ পরিবর্তন করতে গেলে তাদেরকে নিয়োগকারীর বাসায় আটক করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। পূর্ণকালীন নিয়োগের শর্তে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকগণ আইনগতভাবে খন্ডকালীন কাজে নিয়োজিত হতে পারেনা। খন্ডকালীন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ তাই কোন প্রকার আইনগত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী হয়না। এছাড়াও পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন আটক রাখা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে না দেওয়া, বেতন না দেওয়া ও কম দেওয়া, অধিক সময় ধরে কাজ করানো, নিয়োগকারীর আত্মীয় স্বজনের বাসায় অতিরিক্ত কাজ করানো, যৌন নির্যাতনসহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এ ধরণের সমস্যা অনেক শ্রমিককেই ভোগ করতে হয়।

বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের মাধ্যমে যারা বিদেশে যান তাদেরকে অন্যান্য গৃহকর্মীদের সাথে প্রথম তিন মাস বাধ্যতামূলকভাবে একটি রুমে বসবাস করতে হয়। এই সময়ে তারা কোন প্রকার সুবিধা এমনকি কোন বেতনও পায়না। কাজে যোগদানের পর তারা চুক্তি অনুযায়ী বেতন পায়না। এমনকি বেশিরভাগ সময় এজেন্সিগুলো তাদের মাসিক বেতন থেকে অর্ধেক টাকা কর্তন করে রাখে।

দেশে ফেরত আসার পর দুর্ভোগঃ দেশে ফেরত আসার পর নারী শ্রমিকগণ চরম সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। বিদেশে থাকার সময় স্বামী বা ভাইয়ের কাছে প্রেরিত টাকায় তার নিজের কোন মালিকানা থাকেনা। দেশে এসে পরিবারে নিয়মিত টাকা দিতে না পারায় পরিবারের সদস্যরাও গুরুত্ব দেয়না। রক্ষণশীল সমাজের মানুষের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে গ্রামের নারী শ্রমিকটি বিদেশে অবশ্যই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই অপবাদ নিয়েই তাকে চলতে হয়, কখনও কখনও স্বামী তাকে তালাক পর্যন্ত দেয়। নারী শ্রমিক যেহেতু নিজের হাতে কোন সঞ্চয় রাখেনা তাই পরিবার হারিয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় তাকে বাকী জীবন কাটাতে হয়।

শ্রমিকদের জন্য সহায়তা:

বিদেশে শ্রমিকগণ বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবেন এটাই কাম্য। কিন্তু দূতাবাসগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং দূতাবাসগুলো মূলত: গন্তব্য দেশের রাজধানী কেন্দ্রিক হওয়ায় রাজধানী থেকে দূরবর্তী স্থানে কর্মরত শ্রমিকগণ প্রয়োজনীয় সেবা পায়না। এছাড়া দূতাবাসগুলোতে বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত না থাকায় এবং দূতাবাসের সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তার দ্বারা এত অধিক সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিককে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় কোন আইন নাই এমনকি তারা আইএলও কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আইনেরও কোনপ্রকার ধার ধারেনা। ফলে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো শ্রমিকদের খুব বেশি সহায়তা করতে পারেনা। তারপরও অনেক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অভিবাসন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ:

সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ সনদ, ১৯৯০ (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990) বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে। তবে, আইএলও কর্তৃক গৃহীত 'মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক অন মাইগ্রেশন' বাংলাদেশ কর্তৃক এখনও অনুমোদিত হয়নি।

গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন নং ১৮৯ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করলেও এখনও অনুসমর্থন করেনি।

এছাড়াও সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, সিডও সনদসহ আইএলও'র বিভিন্ন কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশনে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন- আইলও কনভেনশন নং ৯৭ (ILO Convention concerning Migration for Employment) আইএলও কনভেনশন নং ১৪৩ (the Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers), আইএলও রিকমেন্ডেশন নং ৮৬ (the Recommendation concerning Migration for Employment),আইএলও রিকমেন্ডেশন নং ১৫১ (the Recommendation concerning Migrant Workers), আইএলও কনভেনশন নং ২৯ (the Convention concerning Forced or Compulsory Labour) আইএলও কনভেনশন নং ১০৫ (the Convention concerning Abolition of Forced Labour)।

অভিবাসন সম্পর্কিত আঞ্চলিক চুক্তি ও ঘোষণা

সার্ক কর্মপরিকল্পনা (কাঠমুন্ড ডিক্লারেশন ২০১৪), কলম্বো প্রসেস (১১ সদস্য রাষ্ট্র ও ৮ পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র), SARTUC অবস্থান পত্র ও আবুধাবি ডায়ালগ ২০১৪।

SARTUC অবস্থান পত্রে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন ও রিক্রুটিং এজেন্সিদের দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ন্যূনতম মজুরি ও সুবিধাদি, সামাজিক নিরাপত্তা, লিঙ্গ সমতা, অভিবাসন প্রক্রিয়া ও মানসম্মত চুক্তি।

কলম্বো প্রসেস এ যেসকল বিষয়ে নীতি পর্যালোচনার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, আন্ত:রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, অভিবাসী শ্রমিকদের রিক্রুটিং এর আইনী কাঠামো তৈরী, চাকুরির চুক্তির ন্যূনতম মান নির্ধারণ, বিদেশ গমনের পূর্বে শ্রমিকদের ধারণা প্রদান ও সফল উদাহরণ কাজে লাগানো, অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল স্থাপন, অভিবাসী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং অভিবাসী শ্রমিকদের রেমিটেন্স প্রেরণ ও ব্যবহার বিষয়ক নীতি তৈরী।

আবুধাবি ডায়ালগ এর ফোকাস হচ্ছে শ্রম বাজারের প্রবণতা, শ্রমিকদের দক্ষতা ও রেমিটেন্স বিষয়ক নীতি এবং উন্নয়নের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা উন্নয়ন, শ্রমিক চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন, অবৈধ নিয়োগ প্রতিরোধ এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত কাঠামো উন্নয়ন।

এছাড়াও রামরু এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইন্‌স্টিটিউট অব হিউম্যান রাইট্‌স এন্ড বিজনেস ব্যবসা ও শ্রমিকের অধিকার বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা ঢাকা নীতিমালা হিসেবে পরিচিত।

অভিবাসন সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ে যেসব আইন ও নীতিমালা রয়েছে সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও নিবন্ধন, অভিবাসী কর্মীর নিবন্ধন ও স্বার্থ সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান চুক্তি, শ্রম কল্যাণ উইং এবং অভিবাসন বিষয়ক চুক্তি, অভিবাসী কর্মীর অধিকার, অপরাধ, দন্ড, বিচার ইত্যাদি), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬,জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ (বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান), সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬ - ২০২০), রেমিটেন্স প্রদানকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা নীতিমালা ২০০৮, রিক্রুটিং এজেন্ট রুল ২০০২, ইমিগ্রেশন রুল্‌স ২০০২ ও সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ।

উত্তরণের উপায় ও করণীয়:

অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা বিধানে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে সরকারকেই। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন ঘোষণা ও আইনের আলোকে গন্তব্য দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে জোরদার দরকষাকষি করতে হবে। আমরা জানি এসডিজির ৮ নং লক্ষ্যে শ্রমিকদের শোভন কাজ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়াও আবুধাবি ডায়ালগ, কলম্বো প্রসেসসহ যেসব উদ্যোগ রয়েছে সেখানে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশের চলমান সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর সর্বশেষ ঢাকা সম্মেলন ২০১৬ এ যেসকল সুপারিশ এসেছে সেগুলো বিবেচনায় সরকারকে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ বাস্তবায়নে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রতারক এজেন্সি ও দালালদের বিচার ও কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। বিদেশে পাঠানোর পূর্বে শ্রমিকদের জন্য যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। অভিবাসী সংক্রান্ত নীতি ও আইনের উপর জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে এবং দেশের সকল ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে এই কার্যক্রমে যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে কাজে লাগিয়ে একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়ে অভিবাসনে ইচ্ছুক শ্রমিকদের নিবন্ধন ও গন্তব্য দেশে কর্মস্থলের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে। কর্মচুক্তিসহ অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সকল নির্দেশনা বাংলায় তৈরি করে শ্রমিকদের সরবরাহ করতে হবে।

গন্তব্য দেশের দুতাবাসগুলোর জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, হালনাগাদ ডাটাবেজ সংরক্ষণ, সেফহোম চালুসহ সেখানে অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেবিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী যেন শ্রমিকগণ কাজ ও মজুরি পায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে সরকারকেই। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরও বেশি তৃণমূলকেন্দ্রিক করতে হবে এবং এর সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে গন্তব্য দেশের ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আইএলওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে গন্তব্য দেশসমূহে অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় উপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন রহিত করার জন্য বাংলাদেশকে শক্তিশালি ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে এবং বিদেশে কর্মরত কোটি মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে সরকার কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করে পরিকল্পনামাফিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

টেকসই উন্নয়ন - কাউকে পেছনে ফেলে নয়

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা [১]

২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা মিলিত হয়ে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে বদলানোর জন্য "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" শীর্ষক এজেন্ডা সর্বসম্মত ক্রমে গ্রহণ করেন। মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়: বিশ্ব দারিদ্র্য ও ক্ষুধা একেবারে দূর করা, অসমতা ও বৈষম্য দূর করে টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। বলা হয়, উন্নয়নের সুফল সবাই ভোগ করবে। অর্জিত সম্পদ সুষম বন্টন হবে। জোর দিয়ে বলা হয়: কাউকে পেছনে ফেলে রাখা হবে না - Leaving no body behind. কাউকে পেছনে ফেলে রেখে টেকসই উন্নয়ন কখনও অর্জিত হবে না।

পনেরো বছর আগে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেখানেও সুষম সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ইপ্সিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। আর উন্নয়নও ছিল অসম। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সর্বক্ষেত্রে পাহাড়সম বেড়ে উঠা অর্থনৈতিক অসমতা ও বৈষম্য দুর করে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নে পৌঁছার জন্য নির্ধারিত এজেন্ডার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে Leaving no body behind অর্থাৎ কাউকে পেছনে রেখে বা ফেলে নয়। এই শ্লোগানটিই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী। কাউকে পেছনে রেখে বা ফেলে নয় - এর অর্থ হলো সর্বস্তরের, সব শ্রেণীর, সব মানুষের উন্নয়ন সমভাবে সম্পন্ন করা। বিরাজমান ও ক্রমবর্ধমান পাহাড়সম অসমতা ও বৈষম্য সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত।

একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই যে, এখনও আমার কাছে সবচাইতে ভীতিকর হলো অসমতা বৃদ্ধি ও উচ্চ প্রবণতা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে; যার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, সংঘর্ষ, বিশৃংখলা ও টেনশন বেড়েই চলছে। দারিদ্র হ্রাসে ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক বিশ্ব মহামন্দা, অর্থনৈতিক দূর্দশা এবং বিশাল বেকারত্ব -এসবের মূলে রয়েছে অসমতা ও বৈষম্য। ২০৩০ সালে পৃথিবীতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায়ও স্বীকার করা হয়েছে যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈষম্য, রাষ্ট্রের ভিতর মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য টিকিয়ে রেখে টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ কেন ২০৬০ সালেও সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ - আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক, এশীয়

---

[১] সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন

উন্নয়ন ব্যাংক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাসমূহ শুধুমাত্র উন্নত দেশ এবং ধনীদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছে; যার ফলে বিশ্ব গরীবদের জন্য এক রকম নরকে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ক্ষমতার জন্য লড়াই চলছে, ধর্মের নামে যুদ্ধ চলছে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ চলছে। শিশুরা টাকার জন্য ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে যোগ দিচ্ছে। চাকুরী - শুধুমাত্র একটি চাকুরীর জন্য শত-সহস্র বিপদ মাথায় নিয়ে নদীতে, উত্তাল সাগরে ডুবে মরছে হাজার হাজার মানুষ। বঙ্গোপসাগরে, ভূমধ্যসাগরে, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের জঙ্গলে গণকবরে শহ-সহস্র অভিবাসী মানুষ! তার সংখ্যার হিসাব কে রাখে?

কিন্তু ক্রমবর্ধমান এ মহাসংকট যার মূল ভিত্তি আয় বৈষম্য ও অসমতা তা অবসানে কার্যকর পদক্ষেপ কোথায়? বরং বৈষম্য বিস্তারের শত শত উদাহরণ চোখের সামনেই আছে। বিশ্বখ্যাত গোগেনহিম কোম্পানীর একজন পরিচালক মিঃ রিচার্ড আর্মস স্ট্রং যিনি আবুধাবীতে কর্মরত, তার বার্ষিক বেতন ৬১২,৫৫০ মার্কিন ডলার সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। অপরপক্ষে, একজন অভিবাসী নির্মাণ শ্রমিকের বার্ষিক বেতন ১,৫০০ মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন বলেছে "২০১৫ সালেও দাস প্রথা আছে এবং ভালভাবেই আছে।" অভিবাসী এক ডজন বা তারও বেশী শ্রমিক একটি কামরায় থাকে, দিনে পনেরো ঘন্টার বেশী সময় কাজ করে, প্রতিবাদ করলে তাদের মারধর করা হয়। দাস প্রথা বা বন্ডেড লেবার নিয়ে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করছে তাদের রিপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে কি দ্রুত গতিতে শ্রম দাসদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিশ্ব সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের সময়েও যদি দাস প্রথা বেড়ে যেতে থাকে তাহলে ২০৩০ সালে কি টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব হবে? কাউকে পেছনে রেখে নয় - কি একটি নিষ্ফল শ্লোগান হয়েই থাকবে? এটা কি শুধু কাগজেই লেখা থাকবে?

আমরা ২০১৬ সালে পদার্পণ করেছি। টেকসই উন্নয়ন শুরু করার প্রথম বৎসর। জাতিসংঘের উচিত, সকল রাষ্ট্রসমূহের উচিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেয়া। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, দূর্বৃত্তায়নের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনৈতিক মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বৈষম্যমূলক বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি ও ধনীদের সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অন্যায্য সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা মানুষের জন্য ৩০ বৎসরেও কোন কল্যাণ আনতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য একটি নতুন অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার মডেল আবিস্কারের জন্য জোরালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এমন বিশ্বায়ন দরকার যা সকল মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবে।

ক্রমবর্ধমান এই অসমতা শুধুমাত্র নৈতিক বিষয় নয়, এর অর্থনৈতিক মূল্যও অনেক এবং ইহা ব্যাপক ভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক এবং টেকসই উন্নয়নকে দারুনভাবে বাঁধাগ্রস্থ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আয় বৈষম্যের সুদূর প্রসারী অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্ব ও জাতীয় অর্থনীতিকে বিকলাঙ্গ করে দিবে। অতিরিক্ত বৈষম্য ও অসমতা বিভিন্ন প্রজন্মের গতিশীলতা রুদ্ধ করবে। সর্বোচ্চ আয়ের লোকেরা রাজনৈতিক দলসমূহের তহবিল সংগ্রহে এবং তা স্ফীত করতে প্রভাব বিস্তার করবে, করতে শুরু করেছে। এর ফলে সরকারসমূহ

এবং রাজনৈতিক দলগুলো ধনীদের পক্ষ অবলম্বন করবে। সাধারণ জনগনের পক্ষে কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। বিরূপ মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। দ্বন্দ্ব ও অরাজকতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে আরও বেশী আয় বৈষম্য ও অসমতা সৃষ্টি করবে। শুধু তাই নয়, এই সুযোগে ধনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত সুকৌশলে এবং অর্থের জোরে প্রায়ই বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন, রাজনৈতিক দলের বড় বড় পদ জুটিয়ে নেন। দেশের পার্লামেন্টে সত্যিকার রাজনীতিবিদদের চেয়ে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের সংখ্যা বেশী হওয়ার নজীর রয়েছে। এভাবে সুকৌশলে সরকারসমূহকে তাদের অনুকূলে সরকারী নীতিমালা প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে এবং সফলও হয়। এর ফলে আন্তরিকভাবে জনকল্যাণ চান, সৎ এবং পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদরাও পুঁজিবাদীদের দাপটের কাছে টিকে থাকতে পারেন না, নতি স্বীকার করেন। শুধুমাত্র একচেটিয়া মুনাফা ভিত্তিক ব্যবসা নীতিমালা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। জনকল্যাণমূখী কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। ফলে অসমতা ও বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। ধনীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, অবাধে বিদেশে টাকা পাচার হয়ে যায়, কালোবাজারী, ফটকাবাজী অতি স্বল্প সময়ে ধনী হওয়ার প্রবণতা সাংঘাতিকভাবে, বেপরোয়াভাবে বেড়ে যায়। সরকারের পক্ষে তখন কোনরূপ জনকল্যাণমুলক আর্থিক সংস্কারও কঠিন, অনেক সময় অসম্ভব হয়ে যায়।

এছাড়া বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা ধনীকে আরো ধনী করার জন্য নিবিষ্ট চিত্তে সুকৌশলে কাজ করছে, তারাও ধনীদের পক্ষে আর্থিক ও ব্যবসায়িক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারসমূহকে প্রভাবিত করে। জনকল্যাণমুলক সকল সেবাখাতসমূহ থেকে ভর্তূকি প্রত্যাহারে বাধ্য করে। ফলে গরীব, শ্রমজীবী স্বল্প আয়ের মানুষদের শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত ব্যয় বেড়ে যায়। কৃষির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। হতদরিদ্র কৃষকরা হয় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। বহুজাতিক কোম্পানীরা নিয়ে আসে ক্ষতিকারক কীটনাশক বীজ, সার প্রভৃতি। জমির উর্বরতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বিষযুক্ত হয় কৃষি পণ্য, শাকসবজি, ফলমূল। মানুষের স্বাস্থ্য হানি হয়, অসুখ-বিসুখ বেড়ে যায়। কিন্তু শিল্পপতিদের সারের ব্যবসা, কীটনাশক ব্যবসা, বীজের ব্যবসা, চিকিৎসা ব্যবসার মুনাফা অনেকগুণ বেড়ে যায়। শ্রমজীবী মানুষের আয় কমে যায়, ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। বৈষম্য বেড়েই চলে। অন্যদিকে এই সুযোগে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে তাদের সরবরাহ চেইনের সর্বত্র প্রতিটি স্তরে সর্বনিম্ন মজুরীতে শ্রমিক নামে শ্রম দাস নিয়োগ করে।

আর্থিক অসমতা ও বৈষম্য সত্তর দশকের শেষ দিকে এবং আশির দশকের প্রথম দিকে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে দানা বাধতে থাকে। ঐ সময় তথাকথিত বিশ্বায়ন নামক একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুক্তবাজার অর্থনীতি, বাণিজ্য উদারীকরণ, অর্থ ও পণ্যের অবাধ চলাচল, সরাসরি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগসহ বেশকিছু কর্মসূচী চালু করে। এই নতুন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নীতিসমূহ গরীব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ প্রমুখের জন্য নিয়ে আসে অকথ্য নির্যাতন, নিষ্পেষণ, দুঃখ-দুর্দশা। রাষ্ট্রায়াত্ব খাতের শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে চাকুরীচ্যুত হয় মিলিয়ন, মিলিয়ন শ্রমিক। প্রাতিষ্ঠানিক খাত বন্ধ হয়ে চাকুরী চলে যায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যৌথ দরকষাকষি দুর্বল

হয়ে যায়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন করা বন্ধ হলো, স্থায়ী চাকুরীর বদলে অস্থায়ী চাকুরী চালু হলো, কর্মঘন্টা ৮ এর বদলে ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা হলো, সব রকম ছুটি, বোনাস, ভাতা, ওভারটাইম বন্ধ হলো। একটি নারকীয় কর্মপরিবেশে কাজ করতে শ্রমিকরা বাধ্য হলো, দাস প্রথা চালু হলো। ফলে শতকরা ৭৭ ভাগ মানুষ আজ মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হলো ১ঃ৯৯। বিশ্বের সকল সম্পত্তির মালিক হলো কয়েকজন বিলিওনিয়ার। ভুল আর্থিক নীতির জন্য এক দশকে ২টি আর্থিক মহামন্দা দেখে সারা বিশ্ব। এক বিলিয়ন শ্রমিক চাকুরীচ্যুত হলো। এক বিলিয়ন শ্রমিকের বেতন কমে গেল। মহামন্দার অব্যাহতি পরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ধনী দেশসমূহের সভায় এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যারা মহামন্দার জন্য দায়ী সেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেই দায়িত্ব দেয়া হলো।

এই দুই মহামন্দার কবল থেকে এখনও বিশ্ববাসী মুক্তি পায়নি। গরীব শ্রমিক, মেহনতী মানুষের বাড়িঘর সংসারের খরচ, বাচ্চাদের পড়াশুনা, চিকিৎসা ও খাদ্যের খরচ বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে মজুরী গেছে কমে। কর্মসংস্থান আশানুরূপ হচ্ছে না। চাকুরীর আশায় কত মানুষ সাগরে জঙ্গলে মারা যাচ্ছে তা আগেই উল্লেখ করেছি। এরূপ অবস্থা মেনে নেয়া যায় না।

উদার বিশ্বায়নের প্রবক্তা ও সমর্থকরা দ্বিমত পোষণ করবেন জানি, কিন্তু আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই বিশ্বায়নই শ্রম বাজারে ধ্বস এনেছে, শ্রমবাজার প্রতিষ্ঠানটিকে ভেঙ্গে-চুরে চুরমার করে দিয়েছে। একে একটি দারুন অস্থিতিশীল জায়গায় নিয়ে এসেছে। শ্রমবাজারে কোন নিয়মনীতি নাই, কোন শৃংখলা নাই। ধনীদের লোভ-লালসার ভিত্তিতে গড়ে তোলা ব্যবসা-বাণিজ্যের মডেল থেকে মুক্তি চায় মানুষ।

এ কথা আজ কে অস্বীকার করবে যে, বর্তমানে সকল বাজারকে একীভূত করার যে প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলো যে দ্রুত গতিতে সরবরাহ চেইন বৃদ্ধি করছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি। কোম্পানীসমূহ কত দ্রুত মুনাফা করা যায় এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। বেশী লাভ করা মানে হলো শ্রমিক শোষণ। কত নারকীয় পরিবেশে, কত বেশী সময় কাজ করিয়ে, কত কম মজুরী দেয়া যায় এই অনৈতিক প্রতিযোগিতাই বিশ্বকে ৯৯ঃ১ এ সমীকরণে দাঁড় করিয়েছে।

তাই সারা বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষ অসমতা ও বৈষম্য থেকে মুক্তি চায়। ২০৩০ সালের জন্য গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্ব মুরব্বীদের এখনই এ দিকে নজর দিতে হবে। আমরা একটি বসবাসযোগ্য পৃথিবী চাই। আয় বৈষম্য ও অসমতা থেকে মুক্তি চাই। এরূপ একটি নতুন পৃথিবীর আশায়ই মানুষ বেঁচে থাকবে।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অবস্থান

সাহিদা পারভীন শিখা[১]

শ্রমবাজারসহ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না তাদের সুযোগ-সুবিধা। দূর হচ্ছে না মজুরি বৈষম্য। সমান কাজে সমান মজুরি দেওয়ার আইন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আইন মানা হয় না। একই কাজ করে একজন পুরুষ যে মজুরি পান, একজন নারী পান তার চেয়ে অনেক কম। এই বৈষম্য কেন করা হয়? নারী শ্রমিকরা কি পুরুষের তুলনায় কাজ কম করেন? তাতো নয়। বিভিন্ন গবেষণায় এটা দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি পরিশ্রমী। তারা বেশি মনোযোগ দিয়ে, ভালো কাজ করেন। অথচ প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের মজুরি দেয়া হয় কম। এটা চলতে দেয়া যায় না, মেনে নেয়া যায় না। যাদের শ্রমে-ঘামে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল থাকে, তাদের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যাপারে চরম উদাসীনতা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। মালিকরা মুনাফা করেন, তাদের গাড়িবাড়ির চাকচিক্য বাড়ে, বিদেশে আনন্দ-ভ্রমণে যেতে কোনো সমস্যা হয় না; সমস্যা হয় নারী শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মত বেতন-ভাতা দেয়ার বেলায়।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শতকরা ৯০ ভাগ নারী শ্রমিক। এই শ্রমিকদের রয়েছে নানা সমস্যা। পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের অনেক ক্ষেত্রেই নিয়োগপত্র দেওয়া হয়না। বাধ্যতামূলকভাবে অনেক রাত পর্যন্ত ওভারটাইম করানো হয়। উপহাস, তাচ্ছিল্য, যৌন নিপীড়ন এবং মানসিক পীড়ন সহ্য করে মেয়েদের চোখ কান বুজে কাজ করতে হয়। সন্তান ধারণ করে নারীরা সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই গর্ভবতী নারীদের প্রতি যেমন সমাজের তেমনি নিয়োগকারী সংস্থা ও রাষ্ট্রের কতগুলো স্বাভাবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে চাকরিজীবী মেয়েদের জন্য বিশেষত নারী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য অনেক সময় মাতৃত্বকালীন ছুটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানেই নারী শ্রমিকদের জন্য প্রসূতিকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নেই। এক্ষেত্রে আইএলও সনদ এবং আমাদের দেশে যে শ্রম আইন আছে তাও যথাযথভাবে কার্যকরী হয় না। এটা মানবিক অধিকারের পরিপন্থী।

পোশাক শিল্প ছাড়াও কৃষি, নির্মাণ, চাতাল, চিংড়ি চাষসহ আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। এসব ক্ষেত্রেও নারী শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি, কাজের সময়সীমাসহ অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধার কোনো নির্দিষ্ট বিধিবিধান নেই। চাকরির

---

[১] ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক। সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা নেই। মালিকপক্ষ যেভাবে নির্ধারণ করেন, সেভাবেই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকদের কাজের কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকায় ক্ষেত্র বিশেষে তাদের ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় নামমাত্র মজুরিতে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, আইএলও, সিডও সনদে নারীদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার বিষয়ে বৈষম্যহীন অবস্থানের পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে। বাস্তবে বৈষম্য চলে আসলেও তার কোনো প্রতিকার হয় না। প্রধানত মালিক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অবহেলা বা বৈরী মনোভাব, প্রচলিত শ্রম আইনের দুর্বলতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতি অথবা দৃঢ় অবস্থান নিতে না পারার কারণেই শ্রমআইনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে নারী শ্রমিকরা বঞ্চিত হন।

আমাদের দেশের নারী আন্দোলন ও সংগঠনের ধারা বৃটিশ যুগ থেকে চলে আসলেও এখনো ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ নিতে পারেনি। অধিকার ও মর্যাদার দিকে থেকেও তাই নারী সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে। আমাদের দেশের নারী সমাজ বৈষম্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ অন্যান্য সামাজিক অনাচারের আঘাতে জর্জরিত। আবার কর্মক্ষেত্রে এসেও তারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যা, বৈষম্য, হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। নিম্ন ও অনিয়মিত মজুরী, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তার অভাব, সাপ্তাহিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি না পাওয়া, যৌন নির্যাতনসহ বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নারী শ্রমিকদের দিন কাটে। অবস্থানগতভাবে নারী শ্রমিকদের সমস্যার ভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সমস্যা তুলনামুলকভাবে অনেক কম। এসব প্রতিষ্ঠানে বেতন, মজুরী ভাতা, কাজের পরিবেশ ও শর্তাদির ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য না থাকলেও এসব সেক্টরে কর্মরত নারীদের ক্ষেত্রে নিয়োগ, পদোন্নতি, পোষ্টিং, সহকর্মী এবং উর্ধ্বতনদের আচরণের বৈষম্য রয়েছে। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতনদের নেতিবাচক আচরণ, সংগঠিত হওয়ার সমস্যাও এসব সেক্টরের নারীদের অন্যতম সমস্যা।

কিন্তু শ্রমিক হিসাবে একজন নারী শ্রমিক দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত সকল আইনগত অধিকারের অংশীদার। নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা, ন্যায্য মজুরী, সাপ্তাহিক ছুটি, জবরদস্তিমুলক শ্রম হতে রক্ষা পাওয়া, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, সংগঠন করার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার একজন শ্রমিকের ন্যায় সংগত অধিকার। একজন শ্রমিক হিসাবে নারী শ্রমিক এসমস্ত অধিকারের সমান অংশীদার। এই সমস্ত আইনানুগ অধিকারগুলো ছাড়াও নারী শ্রমিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু অধিকার। যেমন: সমকাজে সমমজুরী, কর্ম ও নিয়োগের সমতা, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, পৃথক পায়খানা/প্রস্রাবখানা/প্রক্ষলেন কক্ষ/ভোজন কক্ষ, শিশুযত্নাগার, অতিরিক্ত ভারবহন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করার অধিকার, নৈশকালীন কাজ না করানো ইত্যাদি।

উল্লেখিত অধিকার সমূহ কারো মনগড়া নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিল সমূহে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। আমাদের জাতীয় সংবিধানের ২৭,২৮, ও ২৯ নং ধারা নারী পুরুষের সমঅধিকার ও সম মর্যাদার বিষয়টি নিশ্চিত করে। জাতীয় জীবনে নারীর যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কতগুলো আন্তর্জাতিক নীতি ও সনদে স্বাক্ষর করেছে যেগুলোতে মানুষ ও নাগরিক হিসেবে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮১ সালে ঘোষিত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের দলিল– যা সংক্ষেপে সিডও সনদ নামে পরিচিত। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৮৯টি দেশের প্রায় ৩০ হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে 'বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন' গৃহীত হয়। নারী উন্নয়নের বৈশ্বিক নির্দেশিকা হিসেবে এই প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের আলোকে নিজ নিজ দেশে নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের মূল লক্ষ্য হলো– অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ এবং সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল পরিমণ্ডলে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে বাধা সমূহ দূর করা। সেই সঙ্গে গৃহ, কর্মক্ষেত্র ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক সকল পরিসরে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা এবং দায়দায়িত্ব সমবন্টনের নীতি প্রতিষ্ঠিত করা। এরই আলোকে ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত ও মন্ত্রী সভায় অনুমোদন হয়েছে।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর আলোকে এখন বাংলাদেশে নারী শ্রমিকদের অবস্থা ও তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ মোট তিনটি ভাগে ৪৯টি অধ্যায় রয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্যের মধ্যে আছে: বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা(১৬.১), রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা(১৬.৩), নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা (১৬.৬), নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা(১৬.৭), নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা(১৬.৮), সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা(১৬.৯), পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, এসিড নিক্ষেপসহ সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা(১৯.১), অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা(২৩.১), সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া(২৩.৫), নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা(২৩.৭), নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি

দেয়া(২৩.৮), সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন মূল্যায়ন নিশ্চিত করা (২৩.১০), নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষলনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা (২৩.১১), নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা(২৬.১), চাকরি ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা (২৬.২), সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকরি ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা (২৬.৩), নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা(২৬.৪), নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা(২৬.৫), নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশিষ্ট সকল অইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা (২৬.৬), কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা(৩১.১), জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা(৩১.২), কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা(৩১.৩)। নারী শ্রমিকদের বিষয়ে নীতিমালায় যেসব ইতিবাচক বক্তব্য রয়েছে, সেগুলো কার্যকর হলে একদিকে যেমন সমাজে বৈষম্য কমবে অন্যদিকে তেমনি নারীদের সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

তবে আইন ও সনদে ভালো ভালো কথা থাকাটাই যথেষ্ট নয়। আসলে প্রয়োজন বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ। আইন ও বাস্তবতার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি। আমরা জানি যে শ্রমিক হিসেবেও যেমন নারীরা শোষিত তেমনি নারী হিসেবেও তারা নানা ধরনের সামাজিক শোষণ,বৈষম্য ও অবিচারের শিকার। নারী শ্রমিকদের জন্য সমান কাজে সমান মজুরি এবং উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা না হলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়তে থাকবে, যা এক সময় শিল্পের শান্তিপূর্ণ উৎপাদন পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে গেলে মালিকরা ফুঁসে ওঠেন। ছাঁটাই করেন। নির্যাতন করেন। এই অবস্থা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ এটা শিল্প এবং শ্রমিক উভয়ের স্বার্থের জন্যই ক্ষতিকর। দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটানোর জন্যই নারীরা ঘর-সংসার ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। অথচ হাড়ভাঙ্গ খাটুনি খেটেও তারা মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাড় করতে পারছে না। উল্টো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে তারা। বেঁচে থাকার জন্য নয়, যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যই নারী শ্রমিকরা কলে-কারখানায়-প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে।

আমাদের পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশি। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে যে নারী শ্রমিকরা অতুলনীয় অবদান রাখছেন– তাদের যে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়, সে কথা সবাই জানেন। পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের যে বেতন দেয়া হয়, তা এত কম যে তাতে সংসার চালানো তো দূরের কথা, একজনের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করাই দুরূহ। ন্যূনতম যে মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছে সেটাও সবাইকে যথারীতি দেওয়া হয় না। পোশাক শিল্পে প্রায়ই শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ না থাকায় পোশাক শিল্পে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলন অনেক সময় নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বেতন-ভাতার জন্য শ্রমিক অসন্তোষের কারণেও যেমন অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, তেমনি মালিকপক্ষের অব্যবস্থাপনার কারণেও অগ্নিকাণ্ডসহ অন্য দুর্ঘটনায় নিরীহ শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটলেও অস্থিরতা-নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তা নিয়ে কয়েকদিন হৈ চৈ হয়, নানা মহল থেকে নানা ধরণের পরামর্শ দেয়া হয়, শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্র খুঁজে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়া হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। মজুরি নিয়ে অসন্তোষ দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয় না। শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার দেওয়া হয় না। আগুন প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয় না। কাজের পরিবেশ ভালো করার পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

গ্রাম থেকে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করতে এসে প্রথমত নারী শ্রমিকেরা উদ্দীপনা ও উৎসাহ পেলেও পরবর্তীতে তাদেরকে ভীষণভাবে হতাশ হতে হচ্ছে। কারখানার কাজের পরিবেশ খুবই খারাপ। গার্মেন্টস্ কারখানাতে ভীষণ গরমের মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় এবং কাজের সময় খুবই দীর্ঘ। বাংলাদেশের পোশাক তৈরির কারখানায় কর্মপরিবেশ এমন অমানবিক যেখানে মেয়েদের "যন্ত্রনারী" বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই শ্রমের বিনিময়ে তারা যা উপার্জন করে তা সচ্ছলভাবে জীবন ধারণের জন্য তেমন যথেষ্ট নয়। গার্মেন্টস সেক্টরে কাজের কোনো নিরাপত্তা যেমন থাকে না, তেমনি চাকরি পরবর্তীকালে পেনশন বা অন্যান্য কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় ছুটির দিন কিংবা সপ্তাহান্তে ছুটির দিনেও কারখানা খোলা থাকে। তাই কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামাফিকই শ্রমিকদের কাজ করতে হয়। যদিও নিয়মানুযায়ী নারী শ্রমিকদের রাত্রির শিফটে কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে পোশাক কারখানায় মেয়েদের কাজ শুরু হয় সকাল ৮টায় এবং শেষ হয় প্রায় রাত্রি ১০টায়। এক্ষেত্রে মেয়েদের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টিকেও কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। গত কয়েক বছরে একাধিক পোশাক তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অনেকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী শ্রমিক। বেশিরভাগ কারখানাতে এমন কর্ম পরিবেশ, যাতে আগুন লাগলে বা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে শিশু ও নারী শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতেও পারে না।

চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত কোটা পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয় না। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলোতেই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বেশি উপেক্ষা করা হয় বলে মনে হয়। এমনও দেখা যায় যে, একটি

প্রতিষ্ঠানে ছয় শতাধিক কর্মজীবীর মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ১২-১৪ জন। হাতেগোনা এই নারীদেরও আবার হয়তো প্রায়ই সহকর্মীদের কটাক্ষ, গঞ্জনাসহ নানা অসৌজন্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ কর্মক্ষেত্র নারীবান্ধব নয়। যৌন হয়রানির ঘটনা ছাড়াও পুরুষ সহকর্মীদের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। অন্যদিকে শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্র ছাড়াও গৃহস্থালি কাজেও অনেক সময় দিতে হয়। খাবার তৈরি করা, সন্তান লালন-পালন করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া– এসব কাজ থেকে কর্মজীবী নারীদেরও রেহাই নেই। ফলে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। পোশাক শিল্পসহ অনেক শিল্প কারখানাতেই কর্মপরিবেশ এমন যে, ওইসব জায়গায় ৪/৫ বছর কাজ করলে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। টয়লেট সুবিধা না থাকায় কিডনিসহ নানা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায় নারী শ্রমিকদের। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সুযোগ কি সব কর্মজীবী-শ্রমজীবী নারীর জন্য প্রযোজ্য হবে? নাকি তৈরি হবে বৈষম্যের নতুন ক্ষেত্র? অনেক প্রতিষ্ঠানেই গর্ভবতী হলে নারী শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়। তাছাড়া মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বেতন-ভাতা-বোনাস ইত্যাদির সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

নারী শ্রমিকদের অনেকক্ষেত্রেই সংগঠিত হওয়া বা ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ নেই। অনেকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। মজুরি বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। চাকরির নিরাপত্তা নেই। বাংলাদেশের শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের যেসব সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা কার্যকর নেই। পোশাক শিল্পে এবং চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার বা ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ আছে। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, এই দুই ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা নানা ধরনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার। যেসব ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ নেই (যেমন, কৃষি, গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি) সে-সব ক্ষেত্রে তাদের শোষণ-বঞ্চনার মাত্রা আরো বেশি। এই অবস্থা চলতে থাকলে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর হবে না। ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী শ্রম শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করার যে কথা বলা হয়েছে তাকে আমরা খুবই ইতিবাচক বলে মনে করছি। নিজেদের ও পেশার নিরাপত্তার জন্য শ্রমজীবী নারীদের সংগঠিত হওয়ার এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে এবং এ লক্ষ্যে দরকার হলে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে তা দৃঢ়ভাবে কার্যকর করতে হবে। একই সঙ্গে দেশে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে সক্রিয়ভাবে নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে রক্ষায় অধিকতর উদ্যোগী হতে হবে। নারী-পুরুষ সমমর্যাদার নীতি প্রসারের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে এবং দরকষাকষিতে অংশগ্রহণকারীদের দলে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। নানা বাস্তব কারণেই বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে পুরুষ প্রাধান্য বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন কাজে নারীর স্বল্পমাত্রায় অংশগ্রহণ এর প্রধান কারণ। শ্রমজীবী নারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য

হারে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে উদ্যোগী হয়ে নারীদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখতে পারে।

আমাদের দেশে যে সব নারী কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয়-উপার্জন করছে, সমাজে ও পরিবারে তাদের অবস্থা ভালো হওয়ার কথা। তাদের মর্যাদা বাড়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে সব ক্ষেত্রে কি তা হচ্ছে? কর্মজীবী নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে রক্ষণশীল না হলেও খুব প্রসারিত হয়েছে সেটাও বলা যায় না। আবার পরিবারেও কর্মজীবী নারীদের অবস্থা সবক্ষেত্রেই খুব উন্নত হয়েছে সেটাও হয়তো না। তাদের ওপর বরং কিছুটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বাইরেও কাজ করতে হচ্ছে আবার সংসারও সামলাতে হচ্ছে। সন্তান লালন-পালন, নারীর সেবাযত্ন ইত্যাদি কাজে পেশাজীবী নারীদেরই সময় দিতে হচ্ছে বেশি। তাছাড়াও উপার্জিত অর্থ নিজের প্রয়োজনমতো ব্যয় করার স্বাধীনতাও শ্রমজীবী নারীর নেই– বেতনের টাকা পয়সা স্বামীর হাতেই তুলে দিতে হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

তারপরও, নানা রকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। মেয়েরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধমান হারে জড়িত হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল রাখতে পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে নারীরাও অবদান রাখছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা খাতে মেয়েদের কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। তৈরি পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। কলকারখানা, ইটভাটা, ধানকল, চালকল, নির্মাণ, রাস্তার মাটিকাটাসহ অনেক জায়গাতেই মেয়েরা কাজ করছে। আজ শহর-শহরতলী, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও নারীরা বাস্তব কারণে ও স্বাধীন চেতনা বোধ থেকে কাজ করতে আসছে। মাটিকাটা, ইটভাঙ্গা, নির্মাণ, শিক্ষকতা, গার্মেন্টস, বিপনী বিতান, ব্যবসা বাণিজ্য, আইন আদালত, চিকিৎসা সেবা, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীসহ এহেন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীর অংশগ্রহণ নেই, নারীরা গৃহস্থালির কাজে মূল্যহীন শ্রম দিয়ে যাচ্ছে আবহমান কাল ধরে। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান বাড়ছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার, বিচারপতি, সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, বাংকের পরিচালকসহ সব নেতৃস্থানীয় এবং চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বে আমাদের দেশের নারীরা নিয়োজিত। বাংলাদেশের নারীরা দেখিয়ে দিয়েছেন দেশ পরিচালনা কিংবা পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া জয় করা কোনটাই তার জন্য অসম্ভব নয়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থান পেয়েছে। তাদের ভূমিকা পুরুষের চেয়ে পাশাপাশি কম নয়।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা এবং নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কাজেই মহল বিশেষের চাপে বা বিরোধিতায় এই নীতি বাস্তবায়নের পথ থেকে পিছিয়ে আসা উচিৎ হবেনা। আমরা যদি একটি বৈষম্যমুক্ত দেশ ও সমাজ চাই তাহলে

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে সরকারকে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগুতে হবে এবং সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক-উদার ও প্রগতিশীল সব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই নীতি বাস্তবায়নে সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে।

আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অসম সামাজিক বিকাশের কারণে নানা ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে বৈষম্য। সম্পদে বৈষম্য, জীবন মানে বৈষম্য, নারী-পুরুষে বৈষম্য। নারী শ্রমিকদের পুরুষের তুলনায় বৈষম্যের শিকার হতে হয়। যা আজকের সভ্য দুনিয়ায় এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিকাশসম্পন্ন বিশ্বে একটি ঘোরতর অপরাধ। মানুষ মাত্রই সমান। তাই মানুষ হিসেবে নারীরাও কোনো ক্ষেত্রেই নিগৃহীত হতে পারে না, পারেনা বৈষম্যের শিকার হতে। এমতাবস্থায় যে সব নারী আজ তাদের দক্ষতা দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলকারখানা ও অফিস প্রতিষ্ঠানে শ্রমের বিনিময়ে অবদান রাখছে তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার, ন্যায্য মজুরি এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রণী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা দরকার।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, নারী শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন ও বৈষম্যের মধ্যে রেখে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই নারী শ্রমিকদের দাবি ও অধিকার আদায়ের জন্য কৃষিসহ সবক্ষেত্রে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিক-কর্মচারীদের একটা মৌলিক অধিকার। সব ধরণের পেশায় নিয়োজিত নারী শ্রমিদের সংগঠিত করা, ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় আনার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোকেও নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমঅংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা না গেলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের স্বার্থে সকল সেক্টরের নারী শ্রমিককে মজুরী বৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করতে হবে।

মহান মে দিবসের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের পাঁচটি শ্রমঘন কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও কর্মঘন্টার পর্যালোচনা

মোঃ মনিরুল ইসলাম[১]

মে মাসের প্রথম দিন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। দিনটি বাংলাদেশে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ের নির্বাহী থেকে শুরু করে সহকারি কর্মচারি পর্যন্ত সকলেই এই দিনে সাধারণ ছুটি ভোগ করে থাকেন। কিন্তু! যাদের ত্যাগের প্রতীক হিসেবে দিবসটির আবির্ভাব হল তাদের বর্তমান অবস্থা কি? তাদের কর্মঘন্টার অবস্থা কি? তাদের উপার্জন কি স্বচ্ছল জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ঠ? এ প্রশ্ন গুলোই ছিল গবেষণাটির মূল জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স মে দিবস কে সামনে রেখে একটি ছোট গবেষণা পরিচালনা করে। পাঁচটি প্রচলিত শ্রমঘন খাতকে এই গবেষণার আওতায় আনা হয় । পদ্ধতিগত ভাবে এ গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দলগত আলোচনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পাঁচটি প্রচলিত শ্রমঘন খাতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মে দিবসের বাস্তব প্রয়োগ বিশেষ করে আট ঘন্টা কর্ম দিবস, ছুটি, শোভন উপার্জন কোনটিই গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নেই।

ভূমিকা

কর্মঘন্টাকে আট ঘন্টায় নামিয়ে আনাই ছিল মহান মে দিবসের মূল চেতনা। আইএলও এর 'কর্মঘন্টা সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯১৯' একই ধারণা গ্রহণ করে। কনভেনশনটির ২ নং ধারায় বলা হয়েছে, "এমন যে কোন সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প উদ্যোগ, যেখানে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি একই পরিবারের সদস্য নন, সেখানে দৈনিক আট ঘন্টা ও সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি কর্মঘন্টা ধার্য করা যাবে না"।

বাংলাদেশ সরকার কর্মঘন্টা সংক্রান্ত আইএলও এর এ কনভেনশনটি অনুসমর্থন করেছে। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে দিবসটি পালিত হচ্ছে । ১৮৮৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরলে পহেলা মে ২০১৭ হবে আর্ন্তজাতিক শ্রম দিবসের ১৩১ তম বছর। মহান মে দিবসকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স পাঁচটি প্রচলিত শ্রমঘন খাতে মে দিবসের বাস্তবতা নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। খাতগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ ১) নিরাপত্তা কর্মী ২) পরিবহন খাত ৩) হোটেল/রেঁস্তোরা ৪) রি-রোলিং মিল ও ৫) হাসপাতাল/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এ প্রবন্ধটি উক্ত গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফলেরই সার-সংক্ষেপ।

---

[১] রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর, বিল্‌স

গবেষণা পদ্ধতি

গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির যৌথ প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণাকার্যটি সম্পাদিত হয়েছে। প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা পর্যালোচনা, জরিপ, দলগত আলোচনা ও সাক্ষাতকার পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুধুমাত্র ঢাকা শহর ও এর পার্শবর্তী এলাকায় সুসংগঠিত প্রশ্নপত্রের আলোকে ২৫০ টি জরিপ পরিচালিত হয়। প্রতিটি খাতে ৫০ টি জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়নের জন্য ঢাকা শহরকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে নিরাপত্তা খাত, হাসপাতাল/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হোটেল রেঁস্তোরার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যথা: ১) ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর, ২) উত্তরা, ৩) বারিধারা, বসুন্ধরা, বনানী, গুলশান, ৪) মতিঝিল, বাসাবো ও ডেমরা, এবং ৫) পুরাতন ঢাকা। প্রতিটি ভাগে ১০ টি করে জরিপ পরিচালনা করা হয়। পরিবহন খাতের বিষয়ে মহাখালী, গাবতলী ও সায়েদাবাদ এ তিনটি বাস টার্মিনাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রি-রোলিং মিলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার ম্যানুয়েল ও আধা-স্বয়ংক্রিয় মিল সমূহকে বিবেচনা করা হয়। জরিপ ও গবেষণা পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ঘাটতি পূরনের জন্য চেকলিস্টের ভিত্তিতে দশজন মালিক প্রতিনিধি, পাঁচজন সরকারি কর্মকর্তা ও পাঁচজন এনজিও/ সিএসও প্রতিনিধির সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সর্বোপরি, খাতভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির সাথে ৫ টি দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণা ফলাফল

ক) নিরাপত্তা কর্মী

দেশে প্রায় ৫০০টি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে ৩ লক্ষাধিক নিরাপত্তা কর্মী কর্মরত আছে (মাহমুদ, ফয়সাল, ২০১৬) । বিল্স এর গবেষণা থেকে দেখা যায়, নব্বই শতাংশের (৯২%) উপরে পুরুষ নিরাপত্তা কর্মী। তবে, এক-দশমাংশের (৮%) কাছাকাছি মহিলা নিরাপত্তা কর্মী। জরিপে দেখা যায়, পাঁচ শতাংশের (৪%) মত আঠারো এর কম বয়সী নিরাপত্তা কর্মী। বেশীর ভাগ নিরাপত্তা কর্মীর (৮২%) পড়াশুনা দশম শ্রেণীর নিচে। তবে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৮%) এসএসসি পাশ বা তারও উপরে পড়াশুনা করেছেন। বেশিরভাগ (৭০ %) নিরাপত্তা কর্মীই পড়েছেন ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত।

পঞ্চাশ শতাংশের বেশী (৫৮%) নিরাপত্তা কর্মীর কোন নিয়োগপত্র নেই। আশি শতাংশ (৮০%) নিরাপত্তা কর্মী দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করেন। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ নিরাপত্তা কর্মী (৪৮%) দৈনিক এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) দৈনিক পনের (১৫) ঘন্টার বেশী কাজ করেন। পঞ্চাশ (৫০%) শতাংশ নিরাপত্তা কর্মী কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিরাপত্তা কর্মীর (৬৬%) সাপ্তাহিক ছুটি নেই এবং আশি শতাংশের বেশী (৮৮%) মে দিবসে ও স্বাভাবিক সরকারি ছুটির দিনে (৮৬%) কাজ করেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬০%) এর আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে মহান মে দিবস সম্পর্কে ধারণা নেই। ছুটি পেলে

তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৬৪%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (২২%), সন্তানের সাথে সময় কাটান বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ সারেন (৪%)। নিরাপত্তা কর্মীরা মাসিক ভাবে মজুরী আয় করেন। তিন-চতুর্থাংশের বেশী নিরাপত্তা কর্মীর (৭৬%) মাসিক মজুরী ১০,০০০ টাকা থেকে ১৭,৫০০ টাকা। নিরাপত্তা কর্মীদের সংগঠন বা ইউনিয়ন সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

খ) পরিবহন (দুরপাল্লা)

বিআরটিএ নিবন্ধিত দুরপাল্লার গণ পরিবহনের সংখ্যা ৪১,৭৭২। সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রচলিত হিসাবসমূহ আমলে নিয়ে অনুমান করা যায়, আরো প্রায় ৫০০০ টি অনিবন্ধিত দুরপাল্লার গণ পরিবহন রয়েছে। প্রতিটি পরিবহনে দুই সিফটে ৬ জন {(ড্রাইভার + সুপারভাইজার + সহকারী) X ২ শিফট} সরাসরি নিয়োজিত এবং অন্তত ১০ টি বাস সম্বলিত কোন পরিবহনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ দুইটি স্টপেজের জন্য প্রতি স্টপেজে ৫ জন করে মোট ১০ জন কর্মরত সহায়ক শ্রমিক ধরলে দুরপাল্লার গণ পরিবহনে সর্বোমোট ৩,২৭,৪০২ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে বলে অনুমিত হয়। পরিবহন খাতের একশ (১০০%) শতাংশই পুরুষ শ্রমিক। পাঁচ শতাংশের (৪%) মত আঠারো এর কম বয়সী শ্রমিক লক্ষ্য করা যায়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের (৬৪%) পড়াশুনা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বা তার নিচে। প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) শ্রমিক ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

পরিবহন খাতের শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। সকল শ্রমিক (১০০%) দৈনিক আট ঘন্টার বেশী কাজ করেন। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিক (৪৬%) দৈনিক পনের ঘন্টার বেশী কাজ করেন। তাছাড়া, এক-তৃতীয়াংশের বেশী শ্রমিক (৪০%) দৈনিক তের থেকে পনের (১৩-১৫) ঘন্টা কাজ করেন। এক-পঞ্চমাংশ (২০%) পরিবহন শ্রমিক কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। প্রায় শত ভাগ শ্রমিকেরই সরকারি ছুটি (৯৮%) নেই।

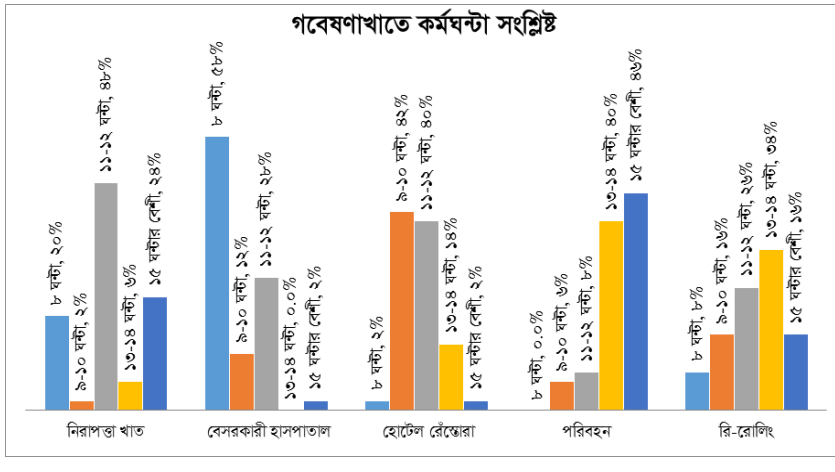

আশি শতাংশের বেশী পরিবহন শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটির দিনে (৯০%) এবং মে দিবসে (৮৪%) কাজ করেন। আকস্মিক ছুটি পেলে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৪৮%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (১৬%), সন্তানের সাথে সময় কাটান (১০%), সিনেমা দেখেন (১০%), কিংবা একটু ঘুমিয়ে নেন (১২%)। পরিবহন শ্রমিকরা সাধারণত (৯৪%) চুক্তি ভিত্তিতে মজুরী আয় করেন। মাসিক মজুরী গড়ে দশ হাজার টাকা (১০,০০০) থেকে বিশ হাজার (২০,০০০) টাকার মধ্যে (৯২%)। নব্বই শতাংশের বেশী (৯২%) শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত।

গ) হোটেল/রেঁস্তোরা

ছোট, মাঝারি ও বড় সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে আনুমানিক ৩০০,০০০ হোটেল/রেঁস্তোরা আছে।[২] এসকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৯৬৭,০০০।[৩] জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, এক-দশমাংশের কাছাকাছি প্রায় ৯৯,০০০ নারী শ্রমিক। তাছাড়া, বিল্‌স এর গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় বিশ ভাগের এক ভাগ (৬%) আঠারোর কম বয়সী শ্রমিক রয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের (৪৪%) কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

নব্বই শতাংশ (৯০%) শ্রমিকের কোন নিয়োগপত্র নেই। তবে, এক-দশমাংশ (১০%) শ্রমিকের নিয়োগপত্র আছে যারা মাঝারি বা বড় আকারের রেস্তোঁরা যেমন, চায়নিজ রেস্তোঁরায় কাজ করেন। প্রায় সকল (৯৮%) শ্রমিক দৈনিক আট ঘন্টার বেশি কাজ

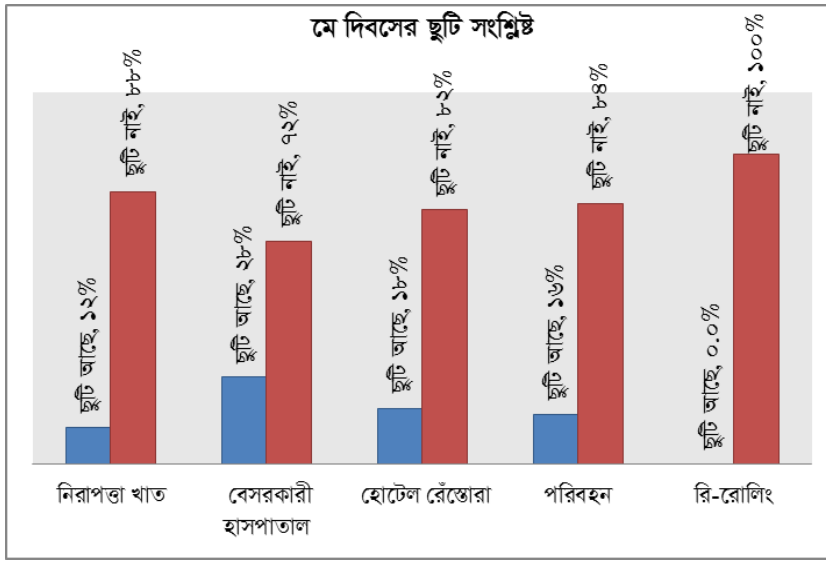

---

২ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হোটেল রেস্টুরেন্ট ফেডারেশন

৩ বিবিএস-২০১৩

করেন। এক-তৃতীয়াংশের (৪২%) বেশি শ্রমিক দৈনিক নয় থেকে দশ (৯-১০) ঘন্টা কাজ করেন, এক-তৃতীয়াংশের (৪০%) বেশি দৈনিক এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন এবং এক-সপ্তমাংশের (১৪%) কাছাকাছি দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ (১৩-১৪) ঘন্টা কাজ করেন। এক-চতুর্থাংশের (২৬%) বেশি হোটেল/রেস্তোরা শ্রমিক কোন নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন। আশি শতাংশের বেশি শ্রমিকের সাপ্তাহিক (৮৬%) কিংবা সরকারী ছুটি (৮২%) নেই এবং তারা মে দিবসেও (৮২%) কাজ করেন। নব্বই শতাংশের বেশি শ্রমিক (৯৪%) মে দিবস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ছুটি পেলে তারা সিনেমা দেখেন (৩৬%), পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৩৬%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (১৬%), কিংবা একটু ঘুমিয়ে নেন (৬%)।

শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি (৩২%) দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী আয় করেন এবং ৬৮% সাপ্তাহিক বা মাসিক মজুরি পেয়ে থাকেন। নব্বই শতাংশ (৯০%) শ্রমিকের মাসিক মজুরী সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে সতের হাজার পাঁচশত টাকার মধ্যে। এক-চতুর্থংশের (২৮%) বেশি মাসিক সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে দশ হাজার টাকা মজুরী আয় করেন, এক-পঞ্চমাংশের (২২%) সামান্য বেশি মাসিক দশ হাজার এক টাকা থেকে বার হাজার পাঁচশত টাকা মজুরী আয় করেন এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) মাসিক বার হাজার পাঁচশত এক টাকা থেকে পনের হাজার টাকা মজুরী আয় করেন। এখাতের পাঁচ শতাংশের (৪%) কম শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে যুক্ত।

ঘ) রি- রোলিং

ম্যানুয়েল, আধা স্বয়ংক্রিয় এবং পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মিলে দেশে বর্তমানে আনুমানিক তিনশটি রি-রোলিং কারখানা আছে।[৪] নব্বই শতাংশের উপর ম্যানুয়েল ও আধা স্বয়ংক্রিয় কারখানা। প্রতিটি কারখানায় গড়ে দুইশত পঞ্চাশ জন শ্রমিক ধরলে তিনশতটি কারখানায় আনুমানিক পঁচাত্তর হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে। রি-রোলিং খাতে কোন নারী শ্রমিক পাওয়া যায় নি। তবে জনাব মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর তথ্য মতে কারখানা পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য নিম্ন প্রবৃত্তিমূলক কাজে পাঁচ শতাংশের মত (৬০০ জন) নারী শ্রমিক আছে। কারখানাসমূহ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম এ দুটি বৃহৎ জোনে বিভক্ত। শ্যামপুর, যাত্রাবাড়ী, পোস্তগোলা, ফতুল্লা, চাষারা, সিদ্দিরগঞ্জ, মুন্সিখোলা, এবং পাগলা মোটাদাগে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত যেখানে প্রায় সবই ম্যানুয়েল ও আধা-সয়ংক্রিয় রি-রোলিং কারখানা। এখানেই জরিপটি পরিচালনা করা হয়।

---

[৪] ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও মালিক সংগঠনের মতে কারখানার সংখ্যা ৩৫০ এর অধিক। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০০। এদের মাঝামাঝি একটি গ্রহণযোগ্য সংখ্যা এখানে গ্রহন করা হয়েছে।

জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, রি-রোলিং কারখানার শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র নেই। শ্রমিকগণ সাধারণত কারখানার ফোরম্যান কর্তৃক দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ম্যানুয়েল ও আধা-সয়ংক্রিয় রি-রোলিং কারখানায় ১৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লৌহ পদার্থ গলানো হয়। শ্রমিকদেরকে সর্বনিম্ন ৬৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই এখানে প্রথাগত কর্মঘন্টার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ একজন শ্রমিকের জন্য দৈনিক কর্মঘন্টা হচ্ছে ২ ঘন্টার একটি শিফট। শুরু এবং শেষ মিলিয়ে যা আড়াই থেকে তিন ঘন্টা হওয়ার কথা। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, রি-রোলিং মিলের নব্বই শতাশেংর বেশি শ্রমিক (৯২%) দৈনিক আট ঘন্টার বেশি কাজ করেন। এক-তৃতীয়াংশের বেশি শ্রমিক (৩৪%) দৈনিক তের থেকে চৌদ্দ (১৩-১৪) ঘন্টা কাজ করেন, এক-চতুর্থাংশের বেশি শ্রমিক (২৬%) দৈনিক গড়ে এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন এবং এক-ষষ্ঠাংশের বেশি শ্রমিক (১৬%) দৈনিক পনের (১৫) ঘন্টা বা তার অধিক সময় কাজ করেন। প্রায় শতভাগ শ্রমিককে (৯৬%) দৈনিক গড়ে দুই (২) থেকে পাঁচ (৫) শিফট পর্যন্ত কাজ করতে দেখা যায়। অর্ধেকের বেশি শ্রমিক (৫৮%) দৈনিক ন্যুনতম তিন (৩) শিফট কাজ করেন এবং এক- চতুর্থাংশের বেশি (২৬%) দৈনিক গড়ে চার (৪) শিফট কাজ করেন। তাছাড়া, প্রায় অর্ধেকাংশ শ্রমিক (৪৪%) দৈনিক গড়ে দুটি (২) কারখানায় কাজ করেন এবং এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি

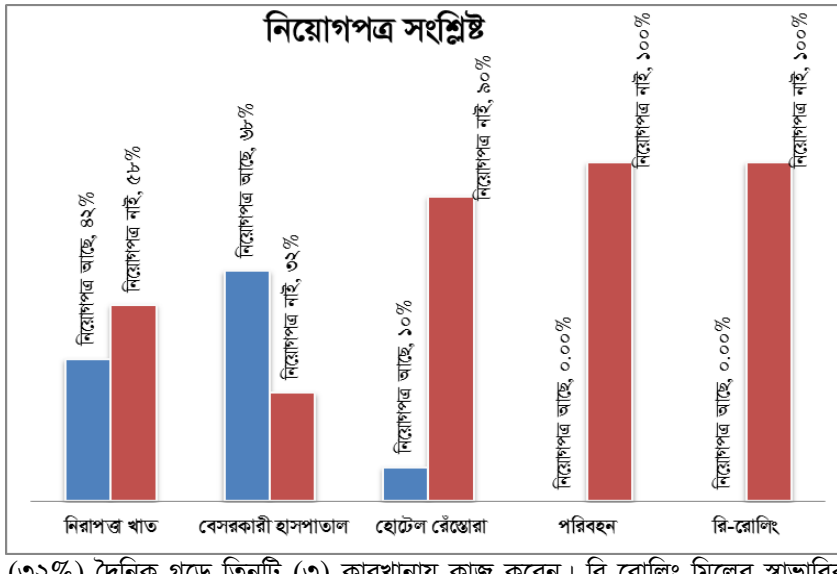

(৩২%) দৈনিক গড়ে তিনটি (৩) কারখানায় কাজ করেন। রি-রোলিং মিলের স্বাভাবিক কর্মঘন্টা হচ্ছে রাত্র এগারটা থেকে সকাল দশটা। শ্রমিকদের কোন সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটি নেই। মে দিবসেও কারখানা খোলা থাকে এবং তাদেরকে কাজ করতে হয়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক (৬২%) আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে মহান মে দিবসের কথা জানেন না। আকস্মিক ছুটি পেলে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৩৪%), সন্তানের

সাথে সময় কাটান (৩৪%), একটু ঘুমিয়ে নেন (১৪%) কিংবা প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ সারেন (১০%)। শ্রমিকেরা সাপ্তাহিক ভাবে মজুরী আয় করেন। মাসিক মজুরী গড়ে দশ হাজার টাকা (১০০০০) থেকে পনের হাজার (১৫০০০) টাকার মধ্যে (৮৮%)।

রি-রোলিং কারখানার শ্রমিক মূলত অনানুষ্ঠানিক ও সেক্টরাল ফেডারেশন ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে যুক্ত। আশির দশকে ৮-১০ টি কারখানা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের কথা জানা গেলেও বর্তমানে কোন কারখানা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের কথা জানা যায়নি। মালিকপক্ষের শক্তিশালী সংগঠন থাকলেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ততা স্বাভাবিকভাবে নেয়া হয়না।

ঙ) বেসরকারি হাসপাতাল/ ডায়াগনিস্টিক সেন্টার

দেশে ৪,৫৯৬ টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং ৯,৭৪১ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সরকারিভাবে নিবন্ধিত রয়েছে (হেলথ্ বুলেটিন ২০১৬)। মোট কর্মরত শ্রমিকের কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, এ খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি। অন্যান্য খাতের তুলনায় এ খাতে অধিকতর শিক্ষিত শ্রমশক্তি রয়েছে। কর্মরত শ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি (৩৪%) এইচ, এস, সি বা তদুর্দ্ধ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

এখাতে কর্মরত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২%) শ্রমিকের কোন নিয়োগপত্র নেই। এক-তৃতীয়াংশের (৪২%) বেশি শ্রমিক দৈনিক আট ঘন্টার বেশি কাজ করেন। যারা আট ঘন্টার বেশি কাজ করেন তাদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৮%) দৈনিক এগার থেকে বার (১১-১২) ঘন্টা কাজ করেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের মে দিবসে কোন ছুটি নেই। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মহান মে দিবস সম্পর্কে সচেতন নয়। পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) শ্রমিককে সরকারী ছুটির দিনে কাজ করতে হয়। প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২২%) শ্রমিকের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। ছুটির দিনে তারা পরিবারের সাথে বাসায় সময় কাটান (৬৪%), পরিবারকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হন (২২%), সন্তানের সাথে সময় কাটান (৮%), সিনেমা দেখেন (৪%), এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ সারেন (৪%)।

এ খাতে কর্মরত শ্রমিকরা মাসিক ভাবে মজুরী আয় করেন। মাসিক মজুরী গড়ে সাত হাজার পাঁচশত টাকা থেকে পনের হাজার টাকার মধ্যে (৮০%)। এক-তৃতীয়াংশের বেশি শ্রমিক (৩৮%) মাসিক দশ থেকে বার হাজার পাঁচশত টাকা মজুরী আয় করেন এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশের (৩২%) মাসিক মজুরী বার হাজার পাঁচশত টাকা থেকে পনের হাজার টাকার মধ্যে। এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠন বা ইউনিয়ন সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মজুরী বিষয়ক তথ্যাদি

মাসিক মজুরী (টাকা)	গবেষণা সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ (%)					মোট
	নিরাপত্তা কর্মী	হাসপাতাল/ ডা. সেন্টার	হোটেল/ রেস্তোরা	পরিবহন	রি-রোলিং	
৫,০০০-৭,৫০০	০.০০	২.০০	৬.০০	২.০০	০.০০	২.০০
৭,৫০১-১০,০০০	১৮.০০	৩২.০০	২৮.০০	৬.০০	২.০০	১৭.২০
১০,০০১-১২,৫০০	৩৬.০০	৩৮.০০	২২.০০	১২.০০	৩৮.০০	২৯.২০
১২৫০১-১৫,০০০	২৬.০০	১০.০০	২৪.০০	২৬.০০	৫০.০০	২৭.২০
১৫,০০১-১৭,৫০০	১৪.০০	৬.০০	১৬.০০	১০.০০	৮.০০	১০.৮০
১৭,৫০১-২০,০০০	৪.০০	৬.০০	২.০০	৪৪.০০	০.০০	১১.২০
২০,০০১ এর উর্দ্ধে	২.০০	৬.০০	২.০০	০.০০	২.০০	২.৪০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উপসংহার

এ গবেষণা থেকে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের দৈনিক আট ঘন্টা কাজের যে মূল চেতনা ছিল, বাংলাদেশের পরিবহন খাতে (মহাসড়ক), হোটেল-রেস্তোরা, রি-রোলিং মিল, নিরাপত্তা সংস্থা এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে তা মেনে চলা হচ্ছে না। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পৃক্ততা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পরিবহন খাত, রি-রোলিং শিল্প এবং হোটেল রেস্তোরা গুলোতে কর্মঘন্টার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া মে দিবসের মূল চেতনার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য যে বিষয় সমূহ রয়েছে, যেমন- শোভন আয়, ছুটি, বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও উল্লিখিত খাত গুলোর সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

গবেষণায় বর্ণিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে উল্লিখিত খাত গুলোতে মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর নিজস্ব সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন আনয়ন ব্যতীত বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়ন অসম্ভব। পাশাপাশি, শ্রমিক বান্ধব এবং একই সাথে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ত্রিপক্ষীয় ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে কর্মসূচি গ্রহণ করা।